তাবলীগ
১৫

মাওলানা যুবায়রুল হাসান কান্ধলভি রহ.

অব্যক্ত বেদনার বিস্মৃত ইতিহাস

সংকলন

মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি

খলিফা ও নাতি, শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভি রহ.
জামাতা, হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান কান্ধলভি রহ.
জেনারেল সেক্রেটারি, জামিয়া মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

তাবলীগ : ১৬

মাওলানা যুবায়রুল হাসান কান্ধলভি রহ.
অব্যক্ত বেদনার বিস্মৃত ইতিহাস

রচনা

মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি

খলিফা ও নাতি, শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ.

জামাতা, হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ.

জেনারেল সেক্রেটারি, জামিয়া মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : মে ২০১৮ ঈ.
শাবান ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ১৪০ [একশ চল্লিশ] টাকা মাত্র

MAOLANA JUBYRUL HASAN KANDHLOWI RH.
Published by : Maktabatul Asad, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 140.00 US $ 20.00 only.

সূচি

তৃতীয় হজরতজির ইনতিকাল ও ফেতনার প্লাবন : ০৭

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর ধৈর্য,
সংযম ও নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা : ১০

তাবলীগের এক পুরনো সাথীর মুখে শুনুন হযরতের
ধৈর্য ও সংযমের সরল স্বীকারোক্তি : ১৮

১. হিংসা ও বিদ্বেষের দুঃখজনক প্রকাশ : ২১

২. আলমি শূরার শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ : ৩০

আলমি শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে
হযরতের আজীবনের মামুল : ৪৭

১. শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে
বাইআত স্থগিত করা : ৪৭

২. শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের
আরেকটি নজির : ৪৯

৩. ফাযায়েলে আমলের মুকাবেলায় মুনতাখাব হাদিস : ৫০

কিতাবটি সম্পর্কে মেহনতের পুরনো
সাথীদের অনুভূতি : ৫৫

মসজিদ সংলগ্ন হুজরা ও অঙ্গীকার লঙ্ঘন : ৭২

একটি শাখা শূরা কমিটি প্রতিষ্ঠা
ও সেই কমিটির পরিণতি : ৭৮

প্রথম চিঠি : ৮১

দ্বিতীয় চিঠি : ৮৩

তৃতীয় চিঠি : ৮৬

ওয়ারিশদের মাঝে বাসভবনের বাটোয়ারা : ৯৭

দুটি জরুরি ব্যাখ্যা : ১০৪

মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার সঙ্গে সম্পর্ক
ও মাদরাসার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি : ১০৬

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রতি গভীর ভালোবাসা : ১১১

মাদরাসাতুশ শায়খ যাকারিয়া
সাহারানপুরের প্রতি অনুরাগ: ১১১

তৃতীয় হজরতজির ইনতিকাল ও ফেতনার প্লাবন

৯ মুহাররম ১৪১৬ হিজরি, মুতাবেক ৯ জুন ১৯৯৫ সালে তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের মাধ্যমে ইতিহাসের এমন একটি সৌভাগ্যমণ্ডিত সোনালী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে, যা সূচিত হয়েছিল হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এর মাধ্যমে।

তাঁর ইনতিকালের পরপরই তাঁর গঠনকৃত আলমি শূরার সদস্যগণ দিল্লি মারকাযে চলে আসেন। যাঁদের মাঝে ছিলেন, হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব, মাওলানা মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব ও জনাব মুহাম্মদ আফযল সাহেব প্রমুখ। জানাযার নামায ও দাফনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর ১২ জুন ১৯৯৫ ঈ. মুতাবেক ১২ মুহাররম ১৪২৬ হি. সেই হযরতগণ তাঁদের সম্মিলিত মাশওয়ারায় দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বের সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন-

১. কোনো ব্যক্তিবিশেষকে 'আমির' নির্ধারণ না করে বাংলাওয়ালি মসজিদের জন্যে পাঁচ সদস্যের শূরা গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, শূরার সদস্যগণ পালাবদলক্রমে এক সপ্তাহের জন্যে ফয়সাল হয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের যাবতীয় উমূর আঞ্জাম দেবেন।

২. নিযামুদ্দিন মারকাযের চৌহদ্দির ভেতরে বাইআতের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এখন থেকে এখানে কেউ বাইআত করতে পারবে না।

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর ওপর মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। তিনি তৃতীয় হযরতজি রহ. এর ইনতিকালের পর আলমি শূরার এই সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাইআত করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অথচ হযরত শায়খুল হাদিস রহ. তাঁকে তাবলীগের উপকারিতার স্বার্থেই ইজাযত ও খিলাফত দান করেছিলেন। সে যুগের অনেক মুরুব্বি বাইআতপ্রত্যাশী লোকদেরকে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে রুহানি সম্পর্ক গড়ে তোলার উপদেশ দিতেন।

তিনি এই মামুল বানিয়ে নিয়েছিলেন যে, কেউ যখন তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার জন্যে জোরাজুরি করতো তখন তিনি শুধু এতটুকু বলতেন যে, 'শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. এর বাইআতই যথেষ্ট। আপনি এখন তাঁর বাতলানো মামুলগুলোর ওপর আমল করতে থাকুন। কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

আমি তাঁর মজলিসে অজস্রবার এ দৃশ্য দেখেছি যে, দাওয়াতের সাথীগণ ও উলামায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছে বাইআত হওয়ার উপর্যুপরি অনুরোধ করতো তখন তিনি পরিষ্কার এ মন্তব্য জানিয়ে অস্বীকার করতেন যে, 'শূরার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।'

গাছ যত বড় ও ঘন ছায়াদার হয়, তার শাখা-প্রশাখা ও ডাল-পালা যত বেশি বিস্তৃত ও দীর্ঘ হয়, সেই বিশাল গাছ যখন কোনো কারণে মাটির ওপর ধসে পড়ে তখন তার পতনের শব্দ যেমন অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ায়, তেমনই তার পতনের কারণে ধুলো-বালিও অনেক দূর পর্যন্ত পরিবেশ নোংরা বানিয়ে ফেলে। নানা বৈচিত্র্য শোভিত এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এমন কিছু আশেকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থাপনা বানিয়ে রেখেছেন, যারা নানা রকমের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের বাহক ও ইহসানি মর্যাদায় উন্নীত হয়ে থাকেন। তাঁদের ইনতিকালের কারণে পৃথিবীর পরিবেশ ও আবহাওয়া শুধু ধুলোধূসরিত ও কর্দমাক্তই হয় না; বরং তাঁদের দিবা-রাত্রির ক্রন্দন ও ফরিয়াদের বরকতে নানামুখী ফেতনার যেই দুয়ার এতোদিন রুদ্ধ ছিল, তাঁদের ইনতিকালের মাধ্যমে সেই দুয়ারের অগল ঝটপট খুলে যায়। তখন শুরু হয় মুনাফেকি ও মুদাহানাত ফিদ-দ্বীন বা ধর্মীয় বিষয়ে চাটুকারিতার এমন মচ্ছব, যা ভেতরের নোংরামি বাইরে এনে আশপাশের মানুষগুলোর পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করে।

তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. নিঃসন্দেহে এ যুগে আল্লাহর একান্ত নৈকট্যশীল বান্দা ছিলেন। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গদের কাতারে ছিল তাঁর অবস্থান। তিনি ছিলেন তাঁর সমকালের মহান মনীষা। দাওয়াত, মেহনত ও দুআর সবিশেষ বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অনন্য বিশিষ্ট। তাঁর মাঝে জালাল ও জামাল তথা প্রতাপ ও সৌন্দর্য্যের অনিন্দ্য সমন্বয়

ঘটেছিল। মহান আল্লাহ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতম অবস্থানের অধিকারী বানিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মাওলানা ইলয়াস রহ.-এর সুযোগ্যতম উত্তরাধিকারী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ.-এর সাচ্চা স্থলাভিষিক্ত। কুতুবুল আলম শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. ও তাঁর সমকালের সকল আকাবির রহ.-এর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের যেই দায়িত্ব লাভ করেন, তা শতভাগ নিষ্ঠার সঙ্গে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যার ফলে দেখা যায়, তাঁর ইনতিকালের পর আল্লাহর চিরন্তন নীতির আরেকবার বাস্তবায়ন ঘটে। খুলে যায় ফেতনার এমন কিছু রুদ্ধ দ্বার, যা এতদিন অগলচাপা ছিল। কবির ভাষায়,

> **'আমার কাঁচা ঘরের দেয়াল মাটিতে ধসে পড়তেই**
> **বন্ধুরা ঘরের উঠোনের মাঝবরাবর রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে।'**

তিনি যেহেতু আলমি (বৈশ্বিক) আমির হওয়ার কারণে আলমি মেহনতের নেতৃত্ব দিতেন, এজন্যে ফেতনাও বিশ্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে।

এর মধ্য হতে কিছু ফেতনা এতটাই বিপদজনক রূপ ধারণ করে যে, নিযামুদ্দিন মারকাযের মূল স্তম্ভ পর্যন্ত কাত হয়ে পড়ে যায়। ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত ও নিষ্ঠার জানাযা বেরিয়ে পড়ে। এমন কদর্য ও কুৎসিত দৃশ্যের কাছে পরাজিত হয় মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর সুমহান আদর্শ।

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.-এর ধৈর্য, সংযম ও নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা

কিন্তু পৃথিবী এখনো স্বীকার করে যে, এমন কঠিন ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতেও মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. অবিচলতা, দৃঢ়তা, হিম্মত ও আল্লাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তের ওপর ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে ছিলেন। চোখের সামনে অসংখ্য অপ্রিয় কাণ্ড ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে দেখেছেন; তারপরও তাঁর মুখে একটিবারের জন্যেও কোনো অভিযোগ বা নালিশজড়ানো শব্দ উঠে আসেনি। তিনি চাইলে ওই সময় পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে অনেক পরিকল্পনা দাঁড় করাতে পারতেন; কিন্তু তিনি আদৌ তা করেননি।

নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতর থেকে তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর নাম-নিশানা ও অবদান মুছে ফেলার একের পর এক চেষ্টা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন, এমনকি খোদ মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.-কে নিযামুদ্দিনের চতুঃসীমার ভেতর নিষ্ক্রীয় করে তোলার জোর চেষ্টা চলেছে। তার সঙ্গে বারবার অবমাননাকর আচরণ করা হয়েছে। পদে পদে তাকে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, আমাদের কাছে এই চতুঃসীমার ভেতর আপনার অস্তিত্ব থাকা-না থাকা দুটোই সমান। গতকাল যেমন আমাদের কাছে আপনার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তেমনই আজও আমাদের কাছে আপনারও কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত ধৈর্য ও সংযমের অসাধারণ ক্ষমতাবলে এই মহান লোকটি প্রতিদিন সকাল নয়টা মারকাযি শূরার বৈঠকে পূর্ণ হাসিমুখ ও প্রশান্ত চেহারা নিয়ে হাজির হতেন। কিন্তু সেখানে তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে যেই আচরণ হতো, বা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের কর্মপন্থা নিয়ে যেসব কাণ্ড ঘটতো, সেগুলো দেখে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে আসতেন। তিনি মাশওয়ারার মাঝে প্রতিদিন এমন স্বৈরাচারী মনোভাবের বাছ-বিচারহীন প্রদর্শনী দেখেও চুপ থাকতেন। মুখ ফুটে কিছুই বলতেন না। ধৈর্যের বাইরে চলে গেলে বড়জোর কয়েকদিন তিনি মাশওয়ারায় হাজির হতেন না।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. এর ইনতিকালের পর তিনি বুঝে ফেলেন, এখন থেকে আমাকে যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে, নিজেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। তখন থেকে তিনি নীরবতা ও মৌনতাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেন। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মারকাযে সব কর্মকাণ্ড ঘটতে দেখতেন, সব কথা শুনতেন; কিন্তু ঠোঁটের ওপর মৌনতার সিলমহর এঁটে এক মুহূর্তের জন্যেও নীরবতা ভাঙতেন না। মূলত তিনি এ ধরনের নীরবতা অবলম্বন করতেন স্বপ্নে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ. এর কাছ থেকে একটি নির্দেশনা পেয়ে, যেখানে তিনি বলেছিলেন,

> **'যুবায়র ও শাহেদ-কে এ কথা বলে দেবেন যে, তারা যেন যবান বন্ধ রাখে; তবে যেন দেখে যায়, কে কী করছে?'**

একদিনের ঘটনা। বরাবরের মতো শূরার বিব্রতকর বৈঠক শেষ করে তিনি যখন তার হুজরায় ফিরে এলেন, ওই সময় তার চোখে-মুখে মাশওয়ারার মজলিসে ঘটে যাওয়া কাণ্ড-কারখানার কারণে স্পষ্টত ছাপ পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তৃতীয় হযতরজি রহ. এর কিছু খাস শিষ্য হুজরার ভেতরে প্রবেশ করে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর তাদের নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে হযরতের মুখ থেকে মন্তব্য শোনার আগ্রহ পেশ করলো।

ওই সময় হযরতের দু'চোখ জ্বলে ওঠেছিল। সংযমের বাঁধ ভেঙে তিনি কিছু কথা বলার উপক্রম হয়ে পড়েছিলেন। আমি সেসময় হুজরাখানায় উপস্থিত ছিলাম। হযরতের মুখ খোলার আগেই আমি বিখ্যাত ফারসি কবি 'খাকানি' এর কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনালাম। কবিতাগুলো শুনে সেই মজলিসের অন্য সাথীদের বিক্ষুব্ধ আবেগ-উত্তেজনা তৎক্ষণাৎ শীতল হয়ে গেল এবং বৈঠকের আলোচনার গতিমুখও বদলে গেল।

খাকানির সেই কবিতাগুলো আপনারাও শুনে নিন-

قل هو الله كه وصف خالق ما است   زير تبت يدا ابي لهب است   گر فر وتر نشست خاقاني نے مرا ننگ نے ترا ادب است

তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর চোখের সামনে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ.-এর ৩২ বছরের নেতৃত্বকালে গৃহীত দাওয়াত ও মেহনতের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধিতা করা হতো। সারাক্ষণ সেখানকার মিম্বার ও মেহরাব থেকে এ ধ্বনি উচ্চারিত হতো যে, 'তাঁর ৩২ বছরের নেতৃত্বকালে মেহনতের মাঝে যেসব অসঙ্গতি ও বিকৃতি অনুপ্রবেশ করে, তা আমি ধীরে ধীরে দূর করব।'

সাহেবযাদা সাহেব (মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব) প্রকাশ্যে সবার সামনে বয়ানের মাঝে এ ঘোষণা করতেন যে,

> **'মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. পর্যন্ত এই মেহনত ছিল দাওয়াতি ও তাবলীগি মেহনত। পরবর্তীকালের লোকেরা একে 'সংগঠন ও আন্দোলন' বানিয়ে ফেলেছে।'**

তার মুখ থেকে এ সব কথা শুনে যেখানে সাধারণ শ্রোতারা নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারত না, সেখানে এ জাতীয় কথা মাওলানা রহ.-কে কী পরিমাণ কষ্ট দিতো, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিদিনের বয়ানের মাঝে অঘোষিতভাবে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল যে, কোনোভাবেই তৃতীয় হযরতজির নাম নেওয়া যাবে না, তাঁর নেতৃত্বে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে কী নীরব ব্যাপকতা এসেছে সে কথা বলা যাবে না; এমনকি দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের বিপুল সম্প্রসারণ ও ব্যাপকায়নের কথাও আলোচনা করা যাবে না। এমন কষ্টদায়ক পরিস্থিতির কারণে আল্লাহর এই মহান বান্দা যদিও মনে মনে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন; কিন্তু কখনই মুখ ফুটে টু শব্দও করেননি। যদি তিনি সামান্য পরিমাণ শব্দ করতেন তাহলে নিঃসন্দেহে একটি বিশাল বড় দুনিয়া তাঁকে সমর্থন জানিয়ে ময়দানে নেমে আসতো। কেননা দুনিয়া তখনো এ পরিমাণ অন্ধ হয়ে যায়নি যে, তারা তৃতীয় হযরতজি রহ.-এর অসামান্য মেহনত ও অবদানের কথা অস্বীকার করে বসবে।[1]

আল্লাহর কী কুদরত! তথাকথিত যেই দাবিদার এখন হযরতজির ৩২ বছরের অসঙ্গতি দূর করার মিশনে নামার দাবি করে বেড়াচ্ছে, তাকে যদি তৃতীয় হযরতজির বিপুল বিস্তৃত ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রবল প্রতাপের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, পথের ধুলোকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। সত্য তো এটাই যে, **لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور** 'দৃষ্টি কখনো অন্ধ হয় না; অন্ধ হয়ে ওই সব অন্তর, যা বুকের ভেতরে রয়েছে।'

বাস্তবতা হলো, বিগত বিশ-বাইশ বছর ধরে নিযামুদ্দিনের মিম্বার হতে শায়খাইন (মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ.)-এর এমন বেশ কিছু মালফুযাত ও ইরশাদাত (বাণী) শোনা যাচ্ছে, যেগুলোর অধিকাংশ যেমন প্রচলিত বই-পুস্তকে নেই, তেমনই এই নবোদ্ভূত কথাগুলো তাঁর কাছের শিষ্যদেরও জানা নেই। এ কারণেই দেখা যায়, এই নতুন মালফুযাতগুলোর ঘ্রাণ খোদ নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতরেই ছড়াচ্ছে না।

---

[1]. তৃতীয় হযরতজি রহ. এর ইনতিকালের পর প্রথম কয়েক বছর সাহেবযাদার মুখে এ ধরনের কথা শোনা যেত যে, 'এই দাওয়াতি মেহনতের দু'জন দুশমন রয়েছে। একজন হলেন শায়খুল হাদিস রহ. যিনি আমার দাদার গদি মৌলভি ইনআমকে দিয়েছেন। অপরজন মৌলভি ইনআম, যিনি এই মেহনতকে আন্দোলনে পরিণত করেছেন।'

কিছু দিন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার এ ধরনের মন্তব্য খোদ তার নিজের জন্যেই মারাত্মক বিপদজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা এ ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে একসঙ্গে দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে সংঘাতে নামা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তখন থেকে তিনি হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর নাম সযতনে এড়িয়ে শুধু তৃতীয় হযরতজি রহ.কে টার্গেট বানিয়ে প্রকাশ্যে নিজের বয়ানের মাঝে এ ধরনের মন্তব্য করে বেড়ানোর কাজ শুরু করে দেন।

মাওলানা ইসমাঈল গোধরা, মাওলানা উসমান কাকুসি, মাওলানা আবদুর রহমান রোয়ানা (মুম্বাই), ব্যাঙ্গলোরের জনাব ফারুক ভাই, মাদ্রাজের প্রফেসর উসমান-সহ যেই পুরনো সাথীরা বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে এই মুবারক মেহনতে নিজেদের জান-মাল ও জীবন-যৌবন ব্যয় করেছেন, তাঁরা সম্মিলিতভাবে গত ২৫ শাওয়াল ১৪৩৭ হি. মুতাবেক ৩০ জুলাই ২০১৬ তারিখে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের যিম্মাদার হযরতগণ ও জাতির সহমর্মী ব্যক্তিত্বদের নামে যেই চিঠি তৈরি করে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বেলজিয়াম, মিসর, ফ্রান্স, ইয়ামান-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তাবলীগের যিম্মাদার হযরতগণের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেই চিঠিতে তাঁরা তৃতীয় হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ.-এর ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করা এবং তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও অবদান মূল্যহীন বানানোর চলমান অপপ্রয়াসের কথা ঠিক এ শব্দে বলেছেন—

> **‘কখনো মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর ত্রিশ বছরের মুদ্দতকে ‘দাওয়াতের নামে সংগঠন’ অভিহিত করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সর্বসাধারণের সামনে এ বয়ান করা হচ্ছে যে, ‘মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. ও মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর যুগে তাবলীগের মেহনত হয়েছে। তাদের পরবর্তীকালে এই মেহনত সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে।’**
>
> **এ ধরনের বয়ানের ফলে এখন এ ক্ষতি হয়েছে যে, একজন সাধারণ সাথীও অবলীলায় বলে বেড়াচ্ছে যে, মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. আগের দু’ হযরতজির দাওয়াত নিজেই বুঝতে পারেননি। তিনি তাঁর ত্রিশ বছরের আমলে এই মেহনতকে বরবাদ করেছেন।’**

এ কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, এ ধরনের বস্তাপঁচা মন্তব্য শুনতে পেয়ে বিগত ২০/২২ বছরের ভেতর দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদের হাজার হাজার চিঠি ইতোমধ্যে হিন্দুস্তান ও কাছের-দূরের অসংখ্য রাষ্ট্র থেকে এ ধরনের চিঠি-পত্র বারংবার আমাদের হস্তগত হয়েছে।

আপনিই বলুন, মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. কি তাঁর ত্রিশ বছরের ইমারতে কোনো ভালো কাজ করেননি! কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেননি! অথচ তাঁর যুগেই এই মেহনতের বিপুল বিস্তৃতি ঘটেছে। তাঁর অস্তিত্ব এই মেহনতের ময়দানে এবং মেহনতের সাথীদের জীবনে এতো ব্যাপক বরকত বয়ে এনেছিলো যে, তাঁর ইনতিকালের পরপরই সাথীদের অন্তরে দুর্বলতা, মেহনতের মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা ও নির্বিশেষে সমস্ত সাথীর অন্তরে হিম্মতশূন্যতা দেখা দিয়েছে এবং তা দিনদিন বেড়েই চলেছে। অথচ সেই শূন্যতা ভরাটের কোনো লক্ষণ অদ্যাবধি দেখা যাচ্ছে না।

সারা পৃথিবীর মুবাল্লিগ যিম্মাদারদের এ ধরনের ডজনখানেক বাহুল্যমুক্ত ও অতিরঞ্জনহীন চিঠি আমি নিজেই পড়েছি। এমন অনেকগুলো চিঠি খোদ আমার কাছেই সংরক্ষিত আছে।

এ সময়ের একটি ঘটনা বলছি। মেহনতের এক পুরনো সাথী অনেক বছর ধরে দিল্লি মারকাযের মুকিম। একদিন আমি খানিকটা আফসোসের সঙ্গে তাঁকে বললাম,

> **‘মাঝে-মাঝে তো আপনি নিজেই আপনার বয়ানের মাঝে হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.-এর নাম নিয়ে কোনো কথা বা তাঁর কোনো ঘটনা বলতে পারেন’।**

আমার এই অনুরোধ শুনে তিনি বিষন্ন অবয়বে ওজর পেশ করে বললেন,

> **‘ভাই, এক মাস-দু’ মাস পরে এক-আধবার বয়ান করার সুযোগ পাই। এ ধরনের কথা বললে সেটাও হারিয়ে ফেলব।’**

এই উত্তর শুনে তাঁর ওজর এড়ানোর কোনো সুযোগ আমি আর পেলাম না। কেননা তিনি যা বলেছেন, সেটাই বাস্তব, সেটাই সত্য। আল্লাহর কুদরত ও তাঁর গায়বি ব্যবস্থাপনার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হলো, তৃতীয় হযরতজি রহ. এর যুগের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে দ্বীন ও ক্বলবওয়ালা বুযুর্গ সর্বসম্মতিক্রমে এই সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তিনি পূর্বের দু’ হযরতের পদচিহ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে, তাঁদের যাবতীয় উসূল ও নকশা মেনে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে সারা পৃথিবীতে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

এর মজবুত সাক্ষী হলো, তাঁর নেতৃত্বের প্রথম দিকে যখন একটি চিহ্নিত এলাকার কিছু লোক সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষের

বিষবাষ্পে নীল হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মোর্চা গড়ে তোলে এবং তার মন্দ প্রভাব মারকায নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দি পর্যন্ত চলে আসে তখন আল্লাহর প্রেমে প্রমত্ত আশেক হযরতজি ইনআমুল হাসান রহ. হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর শরণাপন্ন হন এবং তাঁর কাছে এ অনুমতি প্রার্থনা করেন যে,

> **'আমি নিযামুদ্দিন মারকায ত্যাগ করে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার অনুমতি চাচ্ছি। সেখানে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ.-এর সংস্পর্শে দাওয়াতের আমল করার অনুমতি দিন'।**

হযরত শায়খুল হাদিস রহ. তখন দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর এই আবেদন নাকচ করে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে,

> **'মৌলভি ইনআম, কখনই এমনটি কোরো না। আমি ভালো করেই জানি যে, এ সময় মারকাযে এমন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই, যার মাঝে এই মেহনতের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা ও সক্ষমতা রয়েছে'।**

যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করে বেড়ায়, তাদের পক্ষেই সম্ভব তাঁর আজীবনের ত্যাগ, ইখলাস ও কুরবানির বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। তারা কখনই এ সত্য স্বীকার করার সাহস দেখাতে পারেনি যে, হযরতের ব্যক্তিত্ব সবসময় এই মেহনতের ক্ষেত্রে স্বার্থের ঊর্ধ্বে ছিল। এরচেয়েও বড় সত্য হলো, একজন দক্ষ নাবিকের কল্যাণে শুধু জাহাজই ঝঞ্ঝাবিক্ষুধ্ব সাগরের তুফান থেকে নিরাপদে বন্দরে পৌঁছে না; বরং সেই জাহাজের যাত্রীদের জীবন ও সম্পদও নিরাপদে পৌঁছে। কিন্তু কিছু হিংসুটে যাত্রী কখনই নাবিকের সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। কবির ভাষায়—

> 'আল্লাহ যেই জাহাজের হিফাযতের সিদ্ধান্ত নেন
> খোদ ঝড় সেই জাহাজকে সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে দেয়।'

আল্লাহর ফয়সালা এখানেও সেই কুদরতি ব্যবস্থাপনায় আরেকবার দৃশ্যপটে চলে আসে। আলমি শূরার অবয়বে মেহনতের জাহাজ স্থলভাগের কাছাকাছি ভিড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রোপকূল ধীরে ধীরে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ব্যক্তিনির্ভর প্রশাসনের বিপরীতে সবার অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন সামনে চলে আসছে। এভাবেই মহান আল্লাহ হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.-এর ব্যক্তিত্বের মোহনীয় ক্ষমতায় বিপর্যয়গুলো উপড়ে ফেলে দিচ্ছেন।

যেহেতু আমাদের এই আলোচনার শিরোনাম ছিল 'ফেতনার প্লাবন' সেহেতু আমরা মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি। হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. বিশ বছরের কর্মজীবনে কীভাবে ছোট-বড় শত শত ফেতনা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মুকাবিলা করেছেন, সেদিকে চলে যাচ্ছি। যেই ফিতনাগুলো তাঁর জীবন থেকে একের পর এক পরীক্ষা নিয়েছে। আর সেই পরীক্ষাগুলোতে তিনি নিঃসঙ্গ অবিচলতা ও অভিযোগহীন সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা পুরো ইতিহাস না টেনে শুধু এমন কিছু নির্দিষ্ট ফেতনার বিবরণ তুলে ধরবো, যেগুলো তাঁর ওপর কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস পর্যন্ত প্রভাব ফেলে রেখেছিল। কিন্তু এরপরও তিনি শুধু এ কথা ভেবে বুক চেপে ধৈর্য ধারণ করে গেছেন যে, মারকায নিযামুদ্দিন ও মেহনতের ঐক্যের ওপর যেন কোনো ধরনের আঁচ না পড়ে। যেন দাওয়াতের আব্রু-ইজ্জতের ওপর কালিমা না লেগে যায়। যত দুর্বল কাঠামোর সঙ্গেই হোক, তারপরও যেন সবার ঐক্য বজায় থাকে।

আল্লাহ তাআলার কাছে পৃথিবীর কারো কোনো কাজ, কারো কোনো নিয়ত অজ্ঞাত নয়। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রতিটি স্পন্দন দেখেন ও জানেন। সেই আল্লাহ জাল্লা জালালুহুকে সাক্ষী করে বলছি, হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.-কে আমি আমার এই জীবনে একটিবারও নিজের ব্যক্তিগত কোনো কারণে কাঁদতে দেখিনি; কিন্তু এই দাওয়াতি মেহনতের জন্যে অসংখ্যবার হেঁচকি তুলে কাঁদতে দেখেছি। আমি যখনই তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে দু' কথা বলার চেষ্টা করেছি তিনি প্রতিবারই আমাকে এ উত্তর দিয়েছেন—

> 'শাহেদ, আমার জীবন মারাত্মক সংকটের মুখে আছে। আমি যদি কিছু বলতে যাই তাহলে ফেতনা দেখা দেবে, আর যদি চুপ থাকি তাহলে এই মেহনতের ক্ষতি হবে, যার যিম্মাদারি আমার ওপর দেওয়া হয়েছে।'

তাবলীগের এক পুরনো সাথীর মুখে শুনুন হযরতের ধৈর্য ও সংযমের সরল স্বীকারোক্তি

এক পুরনো সাথীর ঘটনা। যিনি দীর্ঘ দিন ধরে নিজের জান, মাল ও ওয়াক্ত দিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে শ্রম

দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান সাউদি আরবে মুকিম। তিনি তার এই ঘটনাটি আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

'আমার জীবনে একবার চরম দুঃসময় নেমে এসেছিল। ওই সময় পরিস্থিতি এতোটাই প্রতিকূলে চলে গিয়েছিল যে, আমার বন্ধু-বান্ধবরা পর্যন্ত আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে এই দাওয়াতি মেহনতের প্রতি আমার মনোযোগ কমে গিয়েছিল। মেহনতের সঙ্গে আগের মত সম্পর্ক ছিল না।

তখন আমার অন্তরে এ কথা আসে যে, মক্কার হেরেম শরিফে গিয়ে আল্লাহর কাছে দু' চোখের পানি ফেলে খুব দুআ করব। সেমতে আমি সেখানে হাজির হই এবং কাবা শরিফের গিলাফের চাদর ধরে অঝোর নয়নে কাঁদি ও দুআ করি। ওই সময় আমার মনে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে এ খেয়াল আসে যে, আমার এখন নিযামুদ্দিনে হাজির হয়ে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর সামনে নিজের পুরো হালত পেশ করে পরামর্শ করা দরকার। আমি বাইরে এসে ফোনে মাওলানার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিল্লি আসার অনুমতি প্রার্থনা করি। হযরত আমাকে সানন্দে সাগ্রহে দিল্লি ডেকে পাঠান।

আমি দ্রুত দিল্লি হাজির হই এবং হযরতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হই। আমি নির্জনে হযরতের কাছে আমার পুরো হালত, পেরেশানি, প্রতিকূলতা ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বিরাজমান দূরত্ব এবং তাদের পক্ষ থেকে যেই কষ্ট-বৈষম্যগুলো পেয়েছি, সেগুলোর বিবরণ তুলে ধরি। হযরত মাথা নত রেখে পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে আমার আবেগে মোড়ানো কথাগুলো শুনতে থাকেন।

আমি যখন আমার কথাগুলো হযরতের সামনে তুলে ধরি তখন তিনি একটি শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'এতক্ষণ তো তুমি তোমার কথা শোনালে। এখন আমার মনের কথাগুলো শোনো।'

এ কথা বলে তিনি প্রচণ্ড বিষণ্ন কণ্ঠে তৃতীয় হযরতজি রহ. এর ইনতিকালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেই কষ্টগুলো পেয়েছেন, পদে পদে যেসব বৈরীতার সম্মুখীন হয়েছেন, নিজের চেয়ে ছোট বয়সীদের কাছ থেকে বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার যেই কাণ্ডগুলো ঘটেছে, একে একে সেই ঘটনাগুলো প্রচণ্ড দুঃখভারাক্রান্ত মনে আমাকে এমনভাবে শোনান যে, টপটপ করে আমার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে শুরু করে। ওদিকে হযরতও অঝোর নয়নে কাঁদছেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত যখন স্বাভাবিক হন তখন আমি পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে এ কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি যে, 'হযরত, আপনার ওপর যে পরিমাণ কষ্ট নেমে এসেছে এবং সেই পাহাড়সম কষ্ট বুকে নিয়ে আপনি যে পরিমাণ ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে আমার কষ্ট ও পেরেশানি কিছুই নয়। এ যেন পাহাড়ের সঙ্গে এক মুঠো ধুলোর তুলনা। সত্যিকারের মুজাহাদা তো আপনিই আঞ্জাম দিচ্ছেন।' এ কথা বলে আমি পুনরায় মাজেরাত পেশ করে হযরতের সামনে থেকে উঠে চলে আসি।

এ ধরনের আরেকটি ঘটনা জনাব হাফেয মুজাহিদুল ইসলাম কানপুরি আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন—

'আমি অনেক দিন ধরেই নিযামুদ্দিন মারকাযে আসি। এই মারকাযে আমার অজস্রবার আসা হয়েছে। একদিন আমি হযরতের কাছে হাজির হয়ে বললাম— হযরত, আপনার প্রতি ও হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর প্রতি আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড ভালোবাসা রয়েছে। যার কারণে আমি যখন মারকাযে এসে নতুন নতুন কথাগুলো শুনি তখন বুকের ভেতর প্রচণ্ড কষ্ট হয়। বলুন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমি কী করতে পারি?'

উত্তরে হযরত বলেন, 'নীরব থাকুন। আর দুআ চালিয়ে যান।'

এ ধরনের আরেকটি ঘটনা তাবলীগের পুরনো সাথীদের জোড়ে ঘটে। আমি সেখানে হাজির হয়েছিলাম। আমি যখন হযরতের কাছে দুআর দরখাস্ত পেশ করি তখন হযরত আমাকে বলেন— 'তোমরা তো এসে তোমাদের কথা আমাদের শোনাও। কিন্তু যারা আমাদের বড় ছিলেন তারা সবাই কবরে চলে গেছেন। বলো, এখন আমরা কার কাছে গিয়ে বলব? আমার কাছে তো এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।' এ কথা বলে হযরত এ পরিমাণ কাঁদতে থাকেন যে, আমার আশপাশের সাথীরাও হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করে।'

শুধু আমি একাই নই; আমার মত অজস্র মানুষ হযরত রহ. এর সেই সীমাহীন ধৈর্য ও অভিযোগহীন সংযমের কথা জানে। সম্ভবত এই ধৈর্য ও সংযমের কারণেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবারিত রহমত বর্ষিত হয়েছে। তিনি অজস্রবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেয়েছেন। সম্ভবত এই ইসতিকলাল তথা

সত্যের ওপর আমরণ অবিচলতা ও দৃঢ়তার কল্যাণে তিনি অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে যিয়ারত লাভ করে ধন্য হয়েছেন। জীবনের সেই পরম সৌভাগ্যগুলো তিনি তাঁর দিনলিপির ডায়রিতে টুকে রাখতেন। সেই স্বপ্নলব্ধ পয়গামের একটি বার্তা এমন যে, সেই বার্তা যদি কেউ শোনে আর তার অন্তরে যৎসামান্য ঈমানি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে, তার বুকে অণু পরিমাণ ইশকে রাসূল ﷺ থাকে তাহলে নির্ঘাত তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাবে।

এখন আমরা হযরতের জীবনে নেমে আসা কিছু ফেতনা ও দুঃখজনক ঘটনা পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি এ বিশ্বাস নিয়ে যে, মহান আল্লাহ অনাগত ভবিষ্যতে এগুলোর অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত বিহিত করবেন। যেই নির্দয়ের দয়া-মায়াহীন আগ্রাসন থেকে কোনো বড় বাঁচতে পারেননি, কোনো ছোট পার পায়নি, কোনো অনুগত রক্ষা পায়নি, কোনো দায়িত্বশীল নিরাপদ থাকেনি, সে লোক হয়তো আজ ইতিহাস ও বাস্তবতা দুমড়ে-মুচড়ে যেমন ইচ্ছে ইতিহাস রচনা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে; কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে সময় একদিন পৃথিবীর সামনে চেপে রাখা সত্যটা ঠিকই জানিয়ে দেবে। যুগ বলে দেবে, কোনটা ঢেঁকিছাটা সত্য আর কোনটা প্রতারণাময় মিথ্যা।

১. হিংসা ও বিদ্বেষের দুঃখজনক প্রকাশ

তৃতীয় হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান কান্ধলভি রহ. এর ইনতিকালের মাত্র দু' দিন পর সর্বপ্রথম যে জোড় হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সাথী ভাইদের নিয়ে নিযামুদ্দিন মারকায দিল্লিতে ১২, ১৩, ১৪ মুহাররম, মুতাবেক ১২, ১৩, ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই জোড়ের দু' দিন পর ১৭, ১৮, ১৯ মুহাররম, মুতাবেক ১৭, ১৮, ১৯ জুন তারিখে হিন্দুস্তানের পুরনো সাথী এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সকল যিম্মাদার সাথী নিযামুদ্দিন মারকাযে সমবেত হন। এমনকি ২৮ মুহাররম, মুতাবেক ২৮ জুনের মিরাঠ ইজতিমাও সার্বিক অস্থিরতা ও অরাজকতার ভেতর দিয়ে কোনোমতে সম্পন্ন হয়।

প্রচণ্ড গরম ও উত্তপ্ত লু হাওয়া তখন থেকেই বইতে শুরু করেছিল। সময়ের সাথে সাথে গরমের উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

আমি যেহেতু ওই সময়কার ঘটনাবলি খুব কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ করছিলাম, এজন্যে খুব ভেবে-চিনতে ধীরে-সুস্থে পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে মিরাঠের সেই ইজতিমায় একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সাহারানপুর থেকে অংশগ্রহণ করি এবং খুবই সাদামাঠাভাবে নীরবে সাহারানপুরেই ফিরেই আসি।

কিন্তু যখন সফর মাসের দু' তারিখে, মুতাবেক ২ জুলাই মেওয়াতের সফর হয়, সেই সফরে বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে এই অধমও মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর সঙ্গে নিযামুদ্দিন থেকে রওয়ানা হই। সেদিন অন্য একটি গাড়িতে মাওলানা উমর পালনপুরি রহ. মেওয়াতের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পালনপুরি রহ. হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাকে তৃতীয় হযরতজি রহ. আরবদের কাছে لسان الدعوة والتبليغ (দাওয়াত ও তাবলীগের মুখপত্র) শব্দে পরিচয় করিয়ে দিতেন। খোদ শায়খুল হাদিস রহ. কয়েক সপ্তাহ ইসতিখারা ও দুআ করার পর যাঁকে মারকাযের জন্যে নির্বাচন করেছিলেন। আমাদের বহনকারী গাড়িটি মাত্র নিযামুদ্দিন থানার গেইটে পৌঁছেছে, ওই সময় সাহেবযাদা মাওলানা সাদ সাহেব প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি সবার সামনে গাড়ি থেকে নেমে তার সমুদয় ক্রোধ আমার ওপর ঝারতে শুরু করেন।

আমি উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সাহেবযাদার দেমাগি হালত দেখে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিই যে, এখন আমাকে পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করে গাড়ি থেকে নেমে যেতে হবে। সেমতে আমি আমার সামানপত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নিচে নেমে যাই। আল্লাহ তাআলার সবিশেষ তাওফিকে আমি পূর্ণ ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়ে সেই সফর তাৎক্ষণিক মুলতবি করে সামান-পত্র নামিয়ে আনি।

ওদিকে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবের পক্ষে যেহেতু নিজের ইজ্জত বাঁচানোই মুশকিল হয়ে পড়েছিল। কারণ তিনি পূর্ব থেকেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে নিরুপায় জীবন যাপন করছিলেন। এজন্যে তিনিও সেই পরিস্থিতিতে পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। প্রচণ্ড কষ্টে তিনিও তখন সফর মুলতবি করার সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধে তিনি মেওয়াত রওয়ানা হন।

আমার সঙ্গে যাচ্ছেতাই আচরণ করার পর সাহেবযাদা তার সমুদয় ক্রোধ উগড়ে ফেলেন মাওলানা উমর পালনপুরি রহ. এর ওপর। এভাবে তার উত্তপ্ত ক্রোধ বর্ষণের একমাত্র কারণ হলো, কেন তার জন্যে মিরাঠের সাথীরা (হাফেয মুহাম্মদ হারুন,

হাফেয সিরাজ, ভাই আমিরুদ্দিন ও হাজি রঈসুদ্দিন সাহেবগণ) বিশেষভাবে নিজেদের গাড়ি নিয়ে এসেছেন?

তখন হাফেয মুহাম্মদ হারুন সাহেব ঘটনাস্থলেই উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা হযরতজি রহ.-এর যুগ থেকে বছরের পর বছর ধরে নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসছি। মেওয়াত ও এর আশপাশের এলাকাগুলোতে হযরতজি রহ. ও মাওলানা উমর পালনপুরি রহ. আমাদের গাড়িতে চড়েই সফর করে থাকেন; কিন্তু সাহেবযাদা সাল্লামাহু তার সেই উত্তর কানেই তুললেন না।[২]

এমন চিৎকার-তাণ্ডবের পর মাওলানা মুহাম্মদ উমর পালনপুরি রহ.ও কোনো ধরনের শব্দ না করে গাড়ি থেকে নেমে আসেন। প্রচণ্ড শারীরিক দুর্বলতা ও রোগ-ব্যাধির প্রকোপে দুর্বল শরীর সত্ত্বেও দু'জন খাদেমের কাঁধের ওপর হাত রেখে ওই সড়কের ওপর তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গীগণ ট্যাক্সিস্ট্যান্ড গিয়ে দ্বিতীয় গাড়ি নিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি এভাবেই সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর মাওলানা রহ.ও পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে, শব্দহীন ধৈর্য ও নীরবতার পরিচয় দিয়ে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সামনেই অন্য একটি গাড়িতে চড়ে মেওয়াতের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর দিবস-রাত এভাবেই প্রচণ্ড বেদনা ও বিষণ্নতায় নীল হয়ে উঠেছিল। ওই সময়কার কথা ও অব্যক্ত অনুভূতির দহন তিনি হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ.কে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে তিনি খানিকটা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ওই চিঠিতে লিখেছিলেন—

> 'হযরত আব্বাজান রহ. এর ইনতিকালের পর থেকে আমার ওপর প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তা ও পেরেশানি চেপে আছে। আগামী ১৯ মার্চ থেকে কলম্বো, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড– এ দেশগুলোতে প্রায় একমাসের দীর্ঘ সফর করতে হবে। প্রচণ্ড অক্ষমতা ও বিপর্যয় নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত দুআ ও মনোযোগের মুখাপেক্ষী। আশা করি, আপনি আপনার দুআয় অধমকে স্মরণ রাখবেন। ২২ রমাযান থেকে সহোদরাও সাহারানপুর থেকে এসেছেন। হযরত আব্বাজান রহ. এর ইনতিকালের কারণে তাঁর মনেও গভীর দাগ পড়েছে। তিনিও মাসনুন সালাম ও দুআর অনুরোধ জানিয়েছেন।[৩]

এ ধরনের কাণ্ড-কারখানা ওই যুগে প্রচুর ঘটেছে। এভাবে কেটে যায় একটি বছর। ১৪১৭ হি./১৯৯৬ ঈ. এর সর্বশেষ সূর্য ডুবে যায়। শুরু হয় নতুন বছর। নতুন বছরের মাত্র এক মাসের মাথায় ৪ সফর ১৪১৭ হি./ ২১ জুন ১৯৯৬ ঈ. তারিখে ঘটে যায় এমন কিছু কাণ্ড, যা অতীতের সমস্ত কাণ্ড-কারখানাকে হার মানায়। সেদিনের পর থেকে প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত মারকাযের চৌহদ্দির ভেতরে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে, যা দাওয়াত ও তাবলীগের ভবিষ্যত ও খোদ মারকাযের কপালে এঁকে দেয় বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

ওই সময়ের দিবা-রাত্রির ঘটনাগুলো অধম নিজের দিনলিপিতে লিখে রেখেছিলাম। এখন সময় হয়েছে, সেই ঘটনাগুলো পূর্ণ সতকর্তার সঙ্গে, খানিকটা সংক্ষেপে জনতার আদালতে মেলে ধরব।

যদিও সেসব ঘটনা ও পরিস্থিতির অনেকগুলো চরিত্র বর্তমান বিশ্ববাসীর সামনে অজানা; কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে অজানা ও অজ্ঞাত নয়। বেশ কিছু নাজুক কারণ সামনে থাকায় আমরা আমাদের এ বইয়ে তাদের নামগুলো পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মহান আল্লাহ তাদের সবার ও আমাদের যাবতীয় গুনাহের ওপর পর্দা ঢেলে দিন। আমিন।

আসুন, দিনলিপির পাতাগুলোর ওপর সংক্ষেপে চোখ বুলিয়ে নিই–

৪ সফর ১৪১৭ হি./জুন ১৯৯৬ ঈ.। মেওয়াত থেকে একের পর এক সংবাদ আসছে যে, মৌলভি... ও মৌলভি.... এখানে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে। তারা স্থানীয় লোকদেরকে মারকাযে এসে নিজেদের দাবি জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করার উৎসাহ দিচ্ছে। তাদের অনেকগুলো দাবির মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো, সকাল এগারোটায় যেই দুআ হয়, তা যেন দু' সাহেবই পরিচালনা করেন। একদিন এই সাহেব। পরদিন ওই সাহেব।[৪]

---

[২]. হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বুঝে আসে যে, মিরাঠের এই সাথীরা ১৯৭১ সাল থেকে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে মারকায যাতায়াত করতেন।

[৩]. চিঠিটি লেখা হয়েছিল ২ শাওয়াল ১৪১৬ হি./ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ঈ.। উদ্ধৃতির জন্যে পড়ুন, মাওলানা মাহমুদ হাসান নদভির লেখা 'তাযকিরায়ে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.।

[৪]. এগুলো হলো, দরবারের খাদেম ও সেবকদের পদক্ষেপ। নয়তো এর আগে খোদ সাহেবযাদা নিজেই রায়ভেন্ডের ইজতিমায় শূরার সামনে বেশ জোরালোভাবে ঠিক এ শব্দে এ সমস্যা উত্থাপন করেছিলেন যে, 'যেহেতু মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব প্রতিদিন বিভিন্ন জামাতের বিদায়ী দুআ পরিচালনা করে থাকেন এজন্যে মানুষ তাকেই

দু-তিন আগে এই প্রসঙ্গে .... অঞ্চলের স্থানীয় পঞ্চায়েতে আলোচনা উঠেছিল। সেখানেও উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছে। মরহুম মাওলানা যুবায়র সাহেবের পক্ষ থেকে এই তথ্য সেখান থেকে আগত লোকদের মাধ্যমে .... এর কাছে পাঠানো হয় যে, তিনি যেন এই ফেতনা থামিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা না করে চুপ থাকাকেই কল্যাণকর মনে করছেন।

৪ সফর, মুতাবেক ২১। জুনের জুমার নামাযে সেখানকার লোকদের আগমন শুরু হয়ে যায়। সেদিন দিবাগত রাতে বসতির একটি মসজিদে প্রচুর পরিমাণ লোক জড়ো হয়। আসর নামাযের পর সেখানে দু'জন আলেম .... বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে নসিহত করেন। ওই নসিহতে তারা উপস্থিত লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু তাদের উত্তেজনা কিছুতেই শীতল হচ্ছিল না। ওই সময় আগত লোকদের মধ্য হতে কিছু লোক যখন ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেন তখন মৌলভি .... তাদেরকে এ কথা বলে থামিয়ে দেন যে, আগামীকাল বারোটার দুআর আগে কেউ যেন স্থান ত্যাগ না করে।

শুক্রবার মাগরিব নামাযের পর স্থানীয় পুলিশ তৎপরতা শুরু করে দেয়। তারা বসতি নিযামুদ্দিনের কয়েকজন মুরুব্বির মাধ্যমে মাওলানা .... এর কাছে সংবাদ পাঠান যে, আমাদের কাছে বিভিন্ন স্থান থেকে এ তথ্য এসেছে যে, বেশ কিছু দুস্কৃতিকারী এখানে জড়ো হয়েছে। আর এই মৌলভি.... ও মৌলভি.... কারা? আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধান করতে চাচ্ছি।

যার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলভি .... হাফেয .... এর মাধ্যমে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর কাছে সংবাদ পাঠান যে, 'এই আগত লোকদের কী বলব? তাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বললে সঙ্গত হবে?' তখন এর উত্তরে মাওলানা যুবায়র সাহেব বলেন, 'আজ থেকে তিন-চার মাস পূর্বেও ঠিক আজকের মতো করে মৌলভি .... মানুষ জড়ো করে হাজির করেছিলেন। তখন আমি আপনার কাছে আমার চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয়টি প্রকাশ করেছিলাম; কিন্তু আপনি কিছুই বলেননি। এখন আমি আপনাকে কী বলবো! আপনি যেমন ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে কথা বলুন।'

পরদিন শনিবার ৫ ই সফর আগত লোকদের বেশ বড় একটি অংশ মাশওয়ারায় ঢুকে পড়ে। মাওলানা যুবায়র রহ. সেদিন ফেতনার ভয়ে মাশওয়ারায় অনুপস্থিত থাকেন। মাশওয়ারায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনুপ্রবেশকারী লোকেরা এ দাবি তোলে যে, জামাতের বিদায়ের ধরন ও দুআর ইনতিযাম পরিবর্তন করা হোক। সেই মাশওয়ারায় মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি তিনবার এ কথা স্পষ্ট করেন যে, আলমি শূরার মাশওয়ারায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সকালের দুআ মাওলানা যুবায়র সাহেবই পরিচালনা করবেন। প্রফেসর নাদের আলি সাহেবও এ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু মাওলানা .... তাকে থামিয়ে দেন। ওই দিন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কারণে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব জামাতের রুখসতি ও দুআর দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এ দু' কাজ মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব সম্পন্ন করেন।

সেই শনিবার সকালে সাহেবযাদা সাহেব মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবের কাছে একটি পত্র নিয়ে হাজির হন। তাকে দেখে যুবায়র সাহেবের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর দু' চোখ বেয়ে দরদর করে এমন ভাবে অশ্রু ঝরতে থাকে যে, একপর্যায়ে তিনি হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করেন। দু' ঘণ্টা পর্যন্ত এমনভাবে কাঁদছিলেন যে, তাঁর পুরো চেহারা লাল হয়ে যায়। মাওলানা মুহাম্মদ আকেল সাহেবের ছেলে মৌলভি মুহাম্মদ জাফর সাহেব তখন আমাদের ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে উঁচু কণ্ঠে বলেন, 'ভাই যুবায়রকে আপনি চুপ করান।'

সাহেবযাদার উপস্থিতিতে আমি তৎক্ষণাৎ এ উত্তর দিই যে,

> 'মৌলভি জাফর, তুমি আজ তাঁকে ভালোভাবে কাঁদার সুযোগ দাও। কারণ হলো, তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও এভাবে তাহাজ্জুদ নামাযে হেঁচকি তুলে কাঁদতেন। তাঁর কান্নার বরকতে মারকায ও মারকাযের মেহনতের ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ ছিল। এখন তিনি নেই। কাজেই তার ছেলে (মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবকে) এখন কাঁদতে হবে। যদি তিনি ক্রন্দন বন্ধ করে দেন তাহলে দুনিয়ার সবগুলো বাতিল এই মারকাযের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।'

হযরতজি মনে করে। এজন্যে নিয়ম হোক, একদিন তিনি দুআ করবেন। অন্যদিন আমি দুআ করব।

এ প্রস্তাব সাহেবযাদা নিজেই বারবার উপস্থাপন করেছেন; কিন্তু সেখানকার শূরার সাথীগণ কখনই তার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এটি ওই সময়কার কথা, যখন সাহেবযাদা তার নিজের প্রতিটি চাওয়া পূরণ করতে ও নিজের যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে রায়ভেন্ডকেই নিজের কেবলা কাবা মনে করতেন। যার কারণে দেখা যায়, বাড়ি বাটোয়ারা, বড় বড় ইজতিমাগুলোতে দুআ-মুসাফাহা, বাইরের বিভিন্ন হুজরার ওপর নিয়ন্ত্রণ-সহ এ জাতীয় সবগুলো বিষয় তিনি নিজেই যেমন রায়ভেন্ড শূরার কাছে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন; তেমনই নিজের আমলাদেরকে দিয়েও উপস্থাপন করিয়েছেন। কিন্তু এখন তো ....। এটি সেই সময়কার কথা, যখন অগ্নিলাভাগুলো টকটকে লাল রং ধারণ করে জ্বলছিল।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ অশ্রু বিসর্জনের পর একপর্যায়ে মাওলানা যুবায়র সাহেব রহ. খানিকটা সুস্থির-স্বাভাবিক হন। আমি তখন তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে দোতলার খাবারের ঘরে নিয়ে যাই। সেখানে উঠেও তিনি দস্তরখানের পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। কিছুতেই তাঁর মুখে খাবার উঠছিল না। তাঁকে এভাবে কাঁদতে দেখে দস্তরখানের সাথীগণও বিষন্ন হয়ে পড়েন। ওই সময় অনেকের চোখ থেকেও টপটপ অশ্রু ঝরতে শুরু করেছিল।

এ দিন (শনিবার) আসর নামাযের পর মাওলানা .... হযরত যুবায়রুল হাসান রহ.-কে মেওয়াতের ইজতিমায় শরিক হওয়ার অনুরোধ করেন। তখন তিনি পরিষ্কার যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে দেন।

পরদিন ৬ সফর রোববার সকালের মাশওয়ারায় মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. যদিও অংশগ্রহণ করেন; কিন্তু সেখানেও তাঁর চোখে-মুখে কান্নার উপস্থিতি ছিল। অশ্রুসিক্ত নয়নেই তাঁর মুখ থেকে তখন এ শব্দ বেরোয়,

> 'আব্বাজানের ইনতিকালের পর থেকে আমার সঙ্গে যেই আচরণগুলো হচ্ছে তা আমার সহ্যের বাইরে। মাওলানা... এদিকে কেন দৃষ্টি দিচ্ছেন না!'

এ দিন (রোববার) আসর নামাযের পর ইজতিমার ময়দান থেকে পনেরো-বিশজন মেওয়াতি সাথী উপস্থিত হয় এবং মাওলানা রহ.কে নিজেদের সঙ্গে করে ইজতিমাস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ সমাদর করে। সেদিন ঈশার নামাযের পর ছাইসার লোকজনও এসেছিল। তারাও তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে জোরাজুরি করেছিল; কিন্তু মাওলানা রহ. তাদেরকেও অক্ষমতা জানিয়ে দেন।

এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতির চতুর্থ দিন সকালের মাশওয়ারায় মাওলানা .... মৌলভি যুবায়র সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন,

> 'তিন-চার দিন পূর্বে তো একটি গ্রুপের লোকজন এসেছিল। এখন শুনতে পাচ্ছি, দ্বিতীয় আরেকটি গ্রুপ এখানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

এ ধরনের শ্লেষমাখা বিদ্রূপাত্মক বাক্য মাওলানা যুবায়র সাহেব বরদাশত করতে পারেননি। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিশের ওপর থেকে নিজের কোমর সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে উত্তর দেন,

> 'জ্বি না। আপনি বিলকুল নিশ্চিন্ত থাকুন। এখানে একটি গ্রুপের লোকজনই আসতে থাকবে। দ্বিতীয় গ্রুপ কখনই আসবে না।'

মাওলানা রহ. এর মুখ থেকে বেরোনো এ কথাটির সততা ও সম্মান আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত বহাল রেখেছেন। যার ফলে দেখা গেছে, মারকাযে সবসময় একটি গ্রুপের লোকজনই ভিড় করেছে। এ ঘটনা বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্টাকারে জানিয়ে দিয়েছে যে, কারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আর কারা বাতিল ও অন্যায়ের পক্ষে। এমনকি আজ একুশ বছর পরও আল্লাহ তাআলা সেই বাপ-বেটার কান্নার বরকতে গোটা দুনিয়াবাসীর চোখের সামনে সত্য ও মিথ্যার মাঝবরবার পরিষ্কার বিভাজনরেখা টেনে রেখেছেন।

এই হৃদয়বিদারক ইতিহাস বাস্তবেই অপূর্ণ থেকে যাবে, যদি পাঠকগণ এই সর্বশেষ তথ্যটুকু না পড়েন। এ ঘটনার পর দিল্লির একজন আধাধার্মিক, আধা রাজনীতিবিদ প্রতাপশালী ব্যক্তি মাওলানা যুবায়র রহ. এর কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠান যে, 'কয়েক দিন পূর্বে মারকাযে আপনার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে, তা শুনে আমি যারপরনেই ব্যথিত। আমি বিশাল জনগোষ্ঠী ও লিডারদের সঙ্গে নিয়ে মারকাযে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাই'।

মাওলানা রহ. যেহেতু ওই সময় প্রচণ্ড ব্যথিত ও বিষণ্ন ছিলেন এজন্যে তিনি নিজেই এর উত্তর না দিয়ে অন্দরমহল থেকে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হাজির হলাম। তিনি আমাকে বলেন, 'এক লোক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে এসেছে। তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যা ইচ্ছে জানিয়ে দাও।'

আমি নিরেট আল্লাহর দেওয়া তাওফিকের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পূর্ণ সাহসের সঙ্গে ওই ব্যক্তির প্রস্তাব শুনে দাঁড়ানো অবস্থাতেই এ উত্তর দিলাম, 'আমাদের দু'জনের পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবেন। তার এই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার ওপর আমাদের পক্ষ থেকে শুকরিয়া জানিয়ে বলবেন যে, ফিলহাল এ ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা আপনাকেও নিরাপদ রাখুন, আমাদেরকেও নিরাপদ রাখুন।'

এই বিশাল জিহাদ সামাল দেওয়ার প্রায় দু' সপ্তাহ পর দিল্লিতে কয়েকজন চিন্তাবিদ ও দূরদর্শী ব্যক্তি পর্যালোচনা বৈঠক আয়োজন করেন। সেখানে বিদ্যমান হাঙ্গামার কারণে 'আমরা কী পেয়েছি ও কী হারিয়েছি?' শীর্ষক প্রশ্ন ওঠে। মজলিসে

অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই এ বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত পেশ করে। বিষয়টি নিয়ে যখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় তখন আমি আমার অভিমত পেশ করে বলি, 'এই পুরো ঘটনায় অধমের মতে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, তিনি তার পক্ষে কোনো গ্রুপ তৈরি হতে দেননি এবং অন্য গ্রুপের কর্মকাণ্ডে বিন্দু পরিমাণ প্রভাবিত হননি। তিনি তাঁর মৌনতার মাধ্যমে মারকাযের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা এবং ভবিষ্যতের নানা শঙ্কা উপস্থিত লোকদেরকে জানাতে সক্ষম হয়েছেন।[৫]

২. আলমি শূরার শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ

যে সকল সৌভাগ্যবান সাথী তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর নৈকট্য পেয়েছেন এবং দেশ-বিদেশের সফরে তাঁর সংস্পর্শ পেয়েছেন, তারা অবশ্যই এ কথা ভালোভাবে জেনে থাকবেন যে, হযরতজি রহ. এই দাওয়াতি মেহনত নিয়ে সবসময় গভীর চিন্তামগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বক্ষণ এই মেহনতের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে নিজেও যেমন ভাবতেন, তেমনই তাবলীগের প্রথম সারির নির্ভরযোগ্য সাথীদেরকে সবসময় চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দিতেন। একটি দুশ্চিন্তা তাঁকে ভীষণভাবে তাড়িয়ে বেড়াতো যে, আলমি মেহনতের এই মুবারক কাজটি যেন আগামীতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত না হয়। এই মেহনতের ঐক্যের ওপর কোনো অশুভ শক্তির বদনজর লেগে এই মেহনত যেন তার অতীত ও বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো বিপরীত গতিমুখের দিকে ছুটতে শুরু না করে। হযরতজি রহ. তাঁর সাধারণ বৈঠক থেকে শুরু করে খাস মসলিসগুলোতে বারবার নানা কায়দায়, নানা বাক্যে বিষয়টির ওপর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই উদ্বেগের কারণে হযরতজি রহ. আগামীতে দাওয়াতি মেহনতের মানহাজ ও কর্মপন্থা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে মেহনতের চারপাশে অনেকগুলো নিরাপত্তাপ্রাচীর দাঁড় করিয়েছিলেন। সেলক্ষ্যে তিনি পৃথিবীর সবগুলো মহাদেশে সফর করেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অজস্রবার সফর করেছেন, সারা বছর হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড় শহরগুলো নিয়মিত চষে বেরিয়েছেন; শারীরিক দুর্বলতা ও কর্মক্লান্তি সত্ত্বেও তিনি সেই ইজতিমাগুলোতে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বয়ান করেছেন; প্রতিবছর পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভুপালের তাবলীগি ইজতিমায় পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন; পৃথিবীর যেকোনো রাষ্ট্রে দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান কার্যক্রমে কোনো ধরনের ব্যত্যয় বা জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক উদ্যোগে তার সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন; হারামাইন শরিফাইন-সহ আরবের বিভিন্ন রাষ্ট্রের দাওয়াতি মেহনতের সাথীদের সঙ্গে সুনিবীড় সম্পর্ক রেখেছেন; আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর মেহনতের হাজার হাজার সাথীদেরকে প্রতিবছর দলে দলে নিযামুদ্দিনে ডেকে এনে তাদেরকে দাওয়াতি মেজাযের অভিন্নতা, দাওয়াতের সাথীদের ওয়াহদাত বা সামগ্রিক ঐক্য এবং সাথীদের পরস্পরে চৈন্তিক ও আদর্শিক বোঝাপোড়া সম্পর্কে হৃদয় বিগলিত ভাষায় বোঝাতেন; দাওয়াতি মেহনতের পাশাপাশি দুআর ইহতিমাম (পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে পালন) এবং দিনভর উমুমি মেহনতের পাশাপাশি গভীর রজনীতে কাতর কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে অবনত মস্তকে দুআ ও রোনাযারি করে দ্বীনের এই বিশেষ মেহনতের সর্বস্তরে আল্লাহর কুদরতি হিফাযত, অনাগত ভবিষ্যতে এই মেহনতের হিফাযত ও অক্ষুণ্নতার দুআ করতেন। তৃতীয় হযরতজি রহ. এর ৩২ বছরের ইমারতের এটাই চিরন্তন আদর্শ।

হযরতজি রহ. এর এ ধরনের আরেকটি আদর্শ হলো, আলমি শূরা। যা তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইখলাসদীপ্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে উম্মতকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর সেই অনন্য উপহারকে পৃথিবী এখন 'আলমি শূরা' হিসেবে জানে।

তৃতীয় হযরতজি রহ. তাঁর জীবনসায়াহ্নে এসে একটি 'আলমি শূরা' গঠন করেন। যা তিনি হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– এই তিন দেশের দশজন পুরনো সাথীকে নিয়ে গঠন করেছিলেন। হযরত রহ. ইচ্ছে করলে নিজের প্রিয় সন্তান মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.কে নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করে যেতে পারতেন। তাঁকে তিনি তাঁর অবর্তমানে এ জামাতের আমির ঘোষণা করে যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে কুরআন, হাদিস, ইসলামি শরিয়াতের অন্যান্য উৎস, সীরাতে রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের আদর্শ ঘটনাবলি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে তিনি

[৫]. এখানে 'বিশাল জিহাদ' শব্দে বোঝানো হয়েছে, যেই কাণ্ডগুলো সফর ১৪১৭ হি. মুতাবেক জুন ১৯৯৬ ঈ. ঘটেছিল। কিন্তু ১৪৩৭ হিজরির পবিত্র রমাযান চলাকালে মারকাযে যেই কাণ্ড ঘটেছে, তা সামনে রাখলে যেকোনো বুদ্ধিমান লোক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, আমরা কিছুই পাইনি; বরং সর্বস্ব খুইয়েছি।

একটি 'আলমি শূরা' গঠন করে সেই শূরার নেতৃত্ব দেন।

হযরতজি রহ. এর ইনতিকালের পর সেই শূরা নিযামুদ্দিন মারকাযের জন্যে মাওলানা ইযহারুল হাসান কান্ধলভি, মাওলানা উমর পালনপুরি, হযরত মিয়াঁজি মেহরাব (মেওয়াত), মাওলানা যুবায়রুল হাসান কান্ধলভি ও মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেবকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পাঁচ সদস্যের শূরা গঠন করে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন যে, এই পাঁচ হযরত আরবি বর্ণমালার ধারাক্রম অনুসারে ফয়সাল-সিদ্ধান্তদাতা হয়ে নিযামুদ্দিন মারকাযের যাবতীয় উমুরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

আল্লাহর অমোঘ বিধান অনুসারে মাত্র দু' বছরের মাথায় এই শূরার তিন সদস্য ইনতিকাল করেন। তখন মেহনতের পুরনো সাথীদের পক্ষ থেকে এই শূন্য স্থানগুলো পূরণ করার অনুরোধ আসতে থাকে। মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে এ ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন যে, সবার সম্মতি নিয়ে শূন্য স্থানগুলোতে অন্য হযরতদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কিন্তু একটি মহল ভবিষ্যতের কিছু গোপন পরিকল্পনার কথা সামনে রেখে অন্যান্য বিষয়গুলোর মতো এ বিষয়েও তার বিরোধিতা করে। মহলটি কোনোভাবেই হযরতের সেই সদিচ্ছার প্রতি বিন্দু পরিমাণ সম্মান দেখায়নি।

ইনতিকালের কয়েক দিন পূর্বেও মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.কে হযরত মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেবের মত পুরনো মুখলিস আকাবির শূরার শূন্যপদ পূরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেই ঘটনা তিনি তার লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন–

> **"এজন্যেই হযরত মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. এর জীবদ্দশাতেই বেশ কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সামনে চলে আসায় কয়েকবার হজরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার মাঝে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কয়েকজন সদস্যকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা পেশ করা হয়েছিলো। তখন এ দরখাস্ত পেশ করা হয়েছিলা যে, এর মাঝেই আগামীর সকল সমস্যার সমাধান নিহিত। জীবনসায়াহ্নে হযরত মরহুম এর জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতও হয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর আখেরাতের ডাক এসে পড়ে। মহান আল্লাহ তাঁকে মাগফিরাত দান করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন।"**

এ নিয়ে টানাপোড়েন চলতে থাকে। সেই টানাপোড়েনের কারণে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি যখন বিপদসীমার বাইরে চলে যায় এবং শঙ্কাগুলো বাস্তব হয়ে সবার চোখের সামনে বিস্ফোরিত হতে থাকে তখন নভেম্বর ২০১৫ ঈ. / মুহাররম ১৪৩৭ হিজরিতে রায়ভেন্ড (পাকিস্তান)-এ অনুষ্ঠিত সালানা ইজতিমায় হিন্দুস্তান-সহ বিশ্বের অপরাপর দেশগুলোর অসংখ্য সাথী একত্র হয়ে শূরার শূন্যপদগুলো পূরণ করার প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

যার প্রেক্ষিতে দু'-তিন দিনের অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনা ও পারস্পরিক পরামর্শের পর নিযামুদ্দিন মারকাযের জন্যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শূরা গঠন করা হয়। সেই শূরার সদস্যগণ হলেন,

১. মাওলানা ইয়াকুব সাহারানপুরি, মুকিম নিযামুদ্দিন দিল্লি
২. মাওলানা ইবরাহিম দেওলা, মুকিম নিযামুদ্দিন দিল্লি
৩. মাওলানা আহমদ লাট, মুকিম নিযামুদ্দিন দিল্লি
৪. মৌলভি মুহাম্মদ সাদ, মুকিম মারকায দিল্লি
৫. মৌলভি যুবায়রুল হাসান, মুকিম মারকায দিল্লি

আলমি শূরার জন্যে উল্লেখিত হযরতদের সঙ্গে আরো কিছু ব্যক্তিকে যুক্ত করে অবশিষ্ট শূন্য স্থানগুলো পূরণ করা হয়। তাদের নামের তালিকা সামনে আসবে।

প্রকৃত বিচারে শূরার সদস্যপদ পূরণের এই উদ্যোগ একটি সাধারণ মামুলি বিষয়। পৃথিবীর সব জায়গায় বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নিজেদের জন্যে নিয়মিত এই কার্যক্রম বেশ সহজেই আঞ্জাম দিয়ে আসছেন; কিন্তু এখানে যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মুনাফার হিসেব-নিকেশ ঢুকে পড়েছিল, এজন্যে বিষয়টি এখানে মারাত্মক জটিল আকার ধারণ করে ফেলে।

সীমাহীন নাজুক পরিস্থিতির কারণে সারা পৃথিবীর মুবাল্লিগ ও দাঈ ভাইদের চোখের সামনে কী-সব কাণ্ড-কারখানা একটার পর একটা ঘটে চলেছে; যেই কাণ্ডগুলো দেখে মানুষ হাসাহাসি করছে, সেগুলোকে কাগজের পাতায় তুলে আনাটা কখনই সুখকর নয়। বিদঘুটে কাণ্ড-কারখানাগুলো দেখে দাওয়াত ও তাবলীগের সাধারণ সাথী থেকে শুরু করে দাওয়াত ও

তাবলীগের রূহানি পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বি শায়খুল হাদিস যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. এর আধ্যাত্মিক সন্তান ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ (যারা সেসময় রায়ভেন্ডে শূরার শূন্যপদ পূরণের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন) অঝোরে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে চলেছেন। তাদের সজাগ অনুভূতি প্রতিমুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চলেছে।

ওই ঘটনাগুলো এখানে কাগজের পাতায় পুনরায় তুলে ধরার প্রয়োজন এ কারণে নেই যে, হোয়াটস-অ্যাপ ও ইউটিউবের মত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে সেই অরুচিকর কাণ্ড-কারখানা এখন হাতে হাতে পৌঁছে গেছে।

শূরার শূন্য পদ পূরণের পর রায়ভেন্ড তাবলীগি মারকায থেকে ৪ঠা সফর ১৪৩৭ হি. মুতাবেক ১৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে পুরো দুনিয়ার মেহনতের সাথীদের উদ্দেশে যেই ঘোষণা জারি করা হয়েছিল, সেই ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো,

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহ তাআলা এ যুগে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে দ্বীনের পুনর্জাগরণের জন্যে বাহ্যিক মাধ্যম-উপকরণ ব্যতিরেকে নববি পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তিগত মুজাহাদা ও কুরবানির মাধ্যমে দ্বীনের মেহনত যিন্দা করার পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়েছেন। তাঁর ইনতিকালের পূর্বে খোদ মাওলানারই নির্দেশে তৎকালীন মুরুব্বিগণ পরস্পরে শলা-পরামর্শ করে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে যিম্মাদার নির্ধারণ করেন। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.-এর পদ্ধতি অনুসারে কুরআন কারিম, হাদিসে রাসূল, সীরাতে নববি ও সীরাতে সাহাবা রাদি.-এর বরকতময় জীবনের আলোকে এই মেহনতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্টাকারে মেলে ধরেন। তিনি সার্বিক ভারসাম্য বজায় রেখে মেহনতের বিশদ বিবরণ ও চিত্র উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেন। তখন এই মেহনত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ইনতিকালের পর শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বিদের পরামর্শে মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর হাতে এই বরকতময় মেহনতের দায়িত্বভার তুলে দেন। তিনি মেহনতের এই তরিকার সর্বোতভাবে হিফাযত করেছেন। তিনি ক্রমসম্প্রসারমান মেহনতের মাঝে আসল তরিকা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সঙ্গীদের পরামর্শে বিভিন্ন দেশে শূরার তরতিব চালু করেন। কোথাও আমিরের সঙ্গে শূরা, কোথাও শূরার সদস্যবর্গের পালাবদল করে ফয়সাল— সিদ্ধান্তদাতা হওয়ার তরতিব জারি করেন। এর পাশাপাশি পৃথিবীর দেশে দেশে দ্রুত বর্ধনশীল মেহনতকে পর্যবেক্ষণ ও মেহনতের মান উন্নত করার জন্যে নিজের সঙ্গে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শূরা যুক্ত করে নেন। যেই শূরা হযরতজি রহ. এর তত্ত্বাবধানে সব জায়গার শূরা ও মেহনতের সাথীদের আস্থা অর্জন করে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। হযরতজি রহ.-এর ইনতিকালের পর এই শূরা পূর্বের সেই কর্মপন্থা অক্ষুণ্ন রেখে মেহনত অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়, যেই কর্মপন্থার ওপর পূর্বের তিন আকাবির মেহনত পরিচালনা করে এসেছেন।

২০১৫ সালের নভেম্বরে নিযামুদ্দিন, রায়ভেন্ড, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের পুরনো যিম্মাদার সঙ্গীরা এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যে, হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার শূন্য পদগুলো পূরণ করা দরকার। কেননা এই শূরার আট সদস্য ইতোমধ্যে ইনতিকাল করেছেন। স্রেফ দু'জন বাকি আছেন। তাহলে এই মেহনতের পথ ও পদ্ধতি নিরাপদ থাকবে। যখনই শূরার মাঝে কোনো সংযোজন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হবে তখন তা এই শূরার পূর্ণ সম্মতিতে হতে হবে। যেন, সবার ঐক্য অক্ষুণ্ন থাকে। নিযামুদ্দিন, রায়ভেন্ড ও কাকরাইলে এই শূরার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো নতুন তরতিব চালু করা যাবে না। কখনো শূরার কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে শূরার অবশিষ্ট সঙ্গীগণের মধ্য হতে কমপক্ষে দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের মঞ্জুরিসাপেক্ষে সেই শূন্যতা পূরণ করা যাবে। যেন, শূরার অস্তিত্ব বহাল থাকে এবং এই মুবারক মেহনত উম্মতের মেহনত ও সর্বমিলিত মেহনত হিসেবে বাকি থাকে।

সব জায়গার পুরনো যিম্মাদারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও অভিমত নেওয়ার পর এই শূরার মাঝে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহহাব সাহেব মাদ্দা যিল্লুহু ও মাওলানা সাদ সাহেব মাদ্দা যিল্লুহুর সঙ্গে নিম্নের সাথীদেরকে যুক্ত করা হলো। ইনশাআল্লাহ, এখন থেকে আগামীতে এই শূরা তেরোজন সঙ্গী নিয়ে গঠিত থাকবে—

১. মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব [নিযামুদ্দিন]

২. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব [নিযামুদ্দিন]
৩. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব [নিযামুদ্দিন]
৪. মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব [নিযামুদ্দিন]
৫. মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব [রায়ভেন্ড]
৬. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব [রায়ভেন্ড]
৭. মাওলানা আবদুল্লাহ খুরশিদ সাহেব [রায়ভেন্ড]
৮. মাওলানা যিয়াউল হক সাহেব [রায়ভেন্ড]
৯. কারি যুবায়র সাহেব [কাকরাইল]
১০. মাওলানা রবিউল হক সাহেব [কাকরাইল]
১১. ভাই ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব [কাকরাইল]

এই শূরার মাঝে নিযামুদ্দিনের যেই পাঁচ সাথী রয়েছেন, তারা নিযামুদ্দিনের শূরার মাঝে থাকবেন। এই শূরা নিযামুদ্দিনের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন করবেন। ৪ ঠা সফর ১৪৩৭ হি./ ১৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে এই সিদ্ধান্তের ওপর যারা স্বাক্ষর করেছেন,

* মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব
* মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব
* মাওলানা আহমদ লাট সাহেব
* মাওলানা ইহসানুল হক সাহেব
* মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব
* মাওলানা ইসমাঈল গোধরা সাহেব
* ড. মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব
* মাওলানা তারিক জামিল সাহেব
* ভাই ফারুক আহমদ সাহেব
* ভাই বখত মীর সাহেব
* ডক্টর সানাউল্লাহ সাহেব
* ডক্টর রুহুল্লাহ সাহেব
* প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব
* ভাই চৌধুরি মুহাম্মদ রফিক সাহেব

আলমি শূরার শূন্যপদগুলো পূরণ করার পর যেই পাঁচ হযরততে নিযামুদ্দিন মারকাযের যাবতীয় বিষয়ে দায়িত্বশীল গঠন করা হয়, তাদের পক্ষ থেকে একটি জরুরি বিশ্লেষণাত্মক চিঠি তাবলীগের সকল সাথীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়। সেই জরুরি চিঠির মাঝে এই বিবরণ লেখা ছিল,

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

১. আল্লাহ তাআলা হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর অন্তরে দাওয়াতের এই মেহনত ইলকা করেছেন (ঢেলে দিয়েছেন)।

২. হযরত মাওলানা সুহায়বুল হাসান সাহেব এই মেহনতের মানহাজ, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিশদাকারে বিশ্লেষণ করেছেন।

৩. হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. সেগুলোকে সুবিন্যস্ত আকারে, সুসংবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন।

৪. আমরা জানি, মেহনত সেই মানহাজের রাজপথের ওপর চলমান থাকবে। এর মাঝে সংযোজন অথবা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে যতক্ষণ পর্যন্ত (নিযামুদ্দিন, রায়ভেন্ড ও কাকরাইল) এই তিন মারকায সর্বসম্মত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা শুরু করা যাবে না। এই উদ্দেশ্যেই হযরতজি রহ. শূরা গঠন করেছিলেন।

এই শূরার মাঝে নিযামুদ্দিনের যেই পাঁচ হযরত অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তারা পালাবদলক্রমে ফয়সাল-সিদ্ধান্তদাতার

দায়িত্ব পালন করবেন।

ওয়াস-সালাম।

এ দুটি চিঠি পাঠকদের সামনে বিশদাকারে তুলে ধরার কারণ হলো, এ দু'টি ছিল আল্লাহর কুদরতের এক অনন্য প্রকাশ। এ চিঠিদুটির মাঝে আমাদের জন্যে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রয়েছে। রায়ভেন্ড মারকায থেকে ৪ঠা সফর ১৪৩৭ হিজরি, মুতাবেক ১৬ নভেম্বর ২০১৫ ঈ. তারিখে প্রথম যেই ঘোষণামূলক চিঠি জারি করা হয় আর এরপর নিযামুদ্দিন মারকাযের ৫ সদস্যবিশিষ্ট শূরার পক্ষ থেকে পুরো দুনিয়ার মেহনতের সাথীদের উদ্দেশে যেই জরুরি ওয়াদাহাতনামা বা জরুরি অবস্থান জানানো হয়, সেই দুটি চিঠির প্রতিটি লাইনে তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.কে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে শুধু স্মরণ করাই হয়নি; বরং তাঁর নাম হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর সঙ্গে পরম শ্রদ্ধাভরে একই বৃত্তের তিনটি ফুলের মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এখান থেকে বুদ্ধিমান লোক খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবেন যে, হযরতজির ইনতিকাল দিবস অর্থাৎ ১০ মুহাররম ১৪১৬ হি. থেকে শুরু করে ৪ সফর ১৪৩৭ হিজরি পর্যন্ত দীর্ঘ এই মুদ্দতে হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.-এর অবদানের গায়ে কালিমা লেপন; এমনকি তাঁর যাবতীয় পদক্ষেপকে অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজনীয় প্রমাণকরণ; চেপে বসা শক্তির ভাষায় 'তাঁর ৩২ বছরের দীর্ঘ আমলে মেহনতের ওপর জেঁকে বসা বিকৃতি ধীরে ধীরে দূর করার' একুশ বছরের মেহনতকে আল্লাহ তাআলা চোখের পলকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, আগামীতেও আল্লাহ তাআলা কুদরতের আরো অনন্য নিদর্শন আমাদের চোখের সামনেই প্রতিভাত করবেন।

পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা সলিমুল্লাহ খান সাহেবের পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি চিঠি এসেছিল। ওই চিঠির উত্তরে আমি একটি বিশদ বিবরণ সম্বলিত চিঠি পাঠিয়েছিলাম। যেহেতু ওই চিঠির মাঝে আলমি শূরার শূন্যপদ পূরণ, শূরার সূচনা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছিলাম, এজন্যে পাঠকবর্গের খেদমতে সেই চিঠি তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি। সেই চিঠি পড়লে বুঝে আসবে, কতটা শক্ত ও মজবুত বুনিয়াদের ওপর আলমি শূরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মুহতারাম মাওলানা সলিমুল্লাহ খান যি-দা মাজদুহুম
শায়খুল হাদিস, জামিয়া ফারুকিয়া করাচি
সদর, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা, পাকিস্তান

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আশা করি, ভালো আছেন। অধমও আল্লাহর অনুগ্রহে ভালো আছে।

শাবানের মধ্যভাগে আমি যখন গুজরাট, ব্যাঙ্গলোর, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের সফরে ছিলাম তখন বার্মা থেকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর ফোন আসে যে, হযরতওয়ালা অধমকে একটি জরুরি চিঠি পাঠাতে চাচ্ছেন; এজন্যে মেইল এড্রেস লাগবে। সেমতে অধম তাকে জামিয়া মাযাহিরুল উলূমের ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু হযরতের কোনো চিঠি অদ্যাবধি পাইনি। সম্প্রতি ১৭ রমাযান দুবাই থেকে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তলহা সাহেব ও অধমের নামে হযরতের একটি যৌথ চিঠির ফটোকপি আমার কাছে পাঠিয়েছে।

চিঠিটি ৪ রমাযান ১৪৩৭ হি./১০ জুন ২০১৬ ঈ. তারিখে লেখা। জানি না, দীর্ঘ কাল এ চিঠিটি কোথায় পড়েছিল! কাজেই এ চিঠির জবাব লেখে হযরতের কাছে পাঠানো অধমের নৈতিক দায়িত্ব ও শিষ্টাচারিক কর্তব্য।

হযরত, নিযামুদ্দিন মারকাযের সাম্প্রতিক জটিলতা প্রসঙ্গে আল্লাহ মালুম, কত যে লোক আমার কাছে সঠিক চালচিত্রের বিবরণ লিখিত আকারে জানতে চেয়েছে; কিন্তু নানাবিধ কারণে প্রতিবারই আমি মৌনতা অবলম্বন করেছি। আমি শুধু এতটুকুই বলেছি যে, মারকাযের কোনো বিষয়ে জানতে হলে সেখানে অবস্থানরত শূরার সাথীবর্গ বা দাওয়াতের পুরনো সাথীদের শরণাপন্ন হোন। কিন্তু হযরতের উচ্চ মর্যাদা ও বুযুর্গসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং শায়খুল হাদিস যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. এর সঙ্গে দ্বীনি বন্ধন ও ইলমি উত্তরাধিকারের অটুট আত্মীয়তার উদ্ধৃতি চলে আসায় আমি অধম এ চিঠির জবাব দিতে বাধ্য। মহান আল্লাহ আমাকে অভিশম্পাতকারী ও

সমালোচকের ডর–ভয় এড়িয়ে অকপটে সত্য বলা ও লেখার সাহস দিন।

হযরত নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, আল্লাহ তাআলা এই অধমকে স্রেফ তাঁর অনুগ্রহে শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ.-এর খেদমতে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার তাওফিক দিয়েছেন। মহান আল্লাহ আমাকে এই সৌভাগ্যও দিয়েছেন যে, হযরতের নেগরানি ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় প্রায় দশ বছর মদিনা মুনাওয়ারায় অতিবাহিত করার সুযোগ পেয়েছি। যার কারণে আমি অধম এমন কিছু ঘটনা ও চালচিত্র জানি, যা অন্য কেউ কখনই জানে না। সেখানকার কিছু ঘটনা আমি আমার সদ্য প্রকাশিত বই 'আলমে আরব মেঁ হযরত শায়খ রহ. কা মাকাম' (আরববিশ্বে শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. এর অবস্থান) এর মাঝে তুলে ধরেছি।

এখানে সংক্ষেপে নিবেদন করছি যে, উলামায়ে কেরাম, মেহনতের পুরনো সাথী, মুবাল্লিগ ও যিম্মাদার হযরতদের পর্যালোচনা ও গভীর নিরীক্ষণ হলো, মারকাযের বিদ্যমান হাঙ্গামা ও ফেতনার মূল কারণ শূরা মেনে না নেওয়া। যেই শূরাব্যবস্থা হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. গভীর চিন্তাভাবনা ও দূরদর্শী অনুসন্ধানের পর মেহনতের প্রথম সারির হযরতদের সঙ্গে দীর্ঘ পারস্পরিক শলা-পরামর্শের পর দাওয়াতের এই মেহনতের হিফাযত এবং ফেতনা-অনিষ্টতার কবল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন।

হযরত নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এই মহান বরকতময় মেহনতের ব্যাপারে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে স্বপ্নযোগে এ সুসংবাদ পেয়েছিলেন যে, 'আমি তোমাকে দিয়ে কাজ নেবো।' স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ হযরত শায়খ রহ. এর আপবীতির মাঝে, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. এর 'দ্বীনি দাওয়াত' গ্রন্থে এবং অধমের লেখা জীবনীগ্রন্থ 'সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান কান্ধলভি রহ.' এর মাঝে সন্নিবেশিত রয়েছে। তখন পর থেকে পূর্ণ ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্বপ্নযোগেপ্রাপ্ত এই দাওয়াতি মেহনত পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উমর পালনপুরি রহ.-কে আল্লাহ তাআলা রহমতের প্রবল বর্ষণে সিক্ত করুন। তিনি স্বপ্নে অজস্রবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করেছেন। সেখান থেকে প্রাপ্ত হিদায়াত ও মাশওয়ারা চিঠিতে লিখে হযরত শায়খুল হাদিস রহ. ও হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.কে অবহিত করতেন। এ দু' হযরত যা বাস্তবায়ন করতেন।

হযরত শায়খুল হাদিস রহ. সেই চিঠিগুলো পড়ে অধমের হাতে তুলে দিতেন। সেগুলো আজো সংরক্ষিত রয়েছে।

এ সম্পর্কিত অনেকগুলো ঘটনার আমি নিজেই চাক্ষুষ সাক্ষী। এখানে শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিখে জানাচ্ছি। হযরত শায়খুল হাদিস রহ. তখন মদিনা মুনাওয়ারায় কিয়াম করতেন। একদিন হযরত অনুভব করলেন, হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. আজকাল দিল্লিতে সবসময় প্রচণ্ড পেরেশান থাকেন। সারাক্ষণ কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন। তখন হযরত শায়খ রহ. মাওলানা মুহাম্মদ উমর পালনপুরি রহ.কে বললেন, মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.কে জিজ্ঞেস করে আমাকে জানান যে, তিনি আজকাল কী নিয়ে এতো বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন? মাওলানা উমর পালনপুরি রহ. যখন তাঁকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন তখন উত্তরে তিনি বলেন, 'হযরতকে লিখে দিন, আমাদের পরবর্তীতে এই দাওয়াতি মেহনতের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত।'

উমর পালনপুরি রহ. এর কাছ থেকে এ সংবাদ জানার পর হযরত শায়খুল হাদিস রহ. তাঁর সবসময়ের অভ্যাস অনুসারে দরবারে রিসালাত থেকে বিষয়টির সমাধান জানার উদ্দেশ্যে নিজের পক্ষ থেকে আবেদন পেশ করেন। তখন সেখান থেকে উত্তর আসে, 'এখন থেকে এই দাওয়াতি মেহনত ইমারতের ভিত্তিতে চলবে না; বরং মাশওয়ারার জামাতের অধীনে পরিচালিত হবে।'

দরবারে রিসালাতের এই পরামর্শে; বরং সঠিকতম শব্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরোক্ষ সিদ্ধান্তে হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. দুনিয়ার সমস্ত তাবলীগি মারকাযে শূরাভিত্তিক নিযাম চালু করেন। যেখানে যেখানে পূর্ব থেকে শূরা চালু ছিল, সেখানে শূরার সদস্য বৃদ্ধি করে মজবুত করেন এবং আরবি বর্ণমালার ধারাক্রম অনুসারে ফয়সালের দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা জানিয়ে দেন।

হযরত নিশ্চয়ই এই বাস্তবতা সম্পর্কেও সম্যক অবগত আছেন যে, হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. যেভাবে একদিকে রুহানিয়্যাত, মা'রেফাত ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে উচ্চতম স্থানে সমাসীন ছিলেন, অন্যদিকে অধ্যয়ন ও জ্ঞানগভীরতার বিচারে তিনি সময়ের বিরলপ্রজ আলেম ছিলেন। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস ও সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাঁর গভীর ও শেকড়স্পর্শী অধ্যয়ন ছিল। যার কারণে মাশওয়ারার জামাত, মাশওয়ারার উসূল, শূরার গুরুত্ব ও অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যাবতীয় আয়াত, হাদিস ও আসার তাঁর দৃষ্টির সম্মুখেই ছিল। যার কারণে তাঁর বয়ানের মাঝে প্রায়সময় কুরআন, হাদিস, উসওয়ায়ে রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনচিত্রের প্রচুর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। আলমি শূরা গঠনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো নিয়ামক ও অনুঘোটক হিসেবে কাজ করেছিল।

মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত থেকে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আহরণ করে, হাদিসের শিক্ষার আলোকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিশীলিত করে ১৯৮৩ সালের রায়ভেন্ড ইজতিমায় হযরত কাজি আবদুল কাদের সাহেব ও হযরত মাওলানা মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেবের মতো আকাবিরে তাবলীগের সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ করে এমন একটি আলমি শূরা গঠন করার ওপর সর্বসম্মত হন, যা এই দাওয়াতি মেহনতের শতভাগ নেগরানি করবে এবং এই মেহনতকে বড়দের মানহাজ থেকে কোনোমতেই বিচ্যুত হতে দেবে না।

সেসময়কার যতটুকু স্মৃতি অধমের মনে আছে, সেখানে আমাদের সমকালের সবার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক, ভাই হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের নাম ছিল না। কিন্তু এ কথার ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত যে, সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন।

সেই আলমি শূরার অধিকাংশ সদস্য যখন ইনতিকাল করেন তখন সবাই এ প্রয়োজন অনুভব করেন; বরং পরিবেশ-পরিস্থিতির তাগাদা ও চাপে সকল পুরনো সাথী বাধ্য করেন যে, আখেরাতে পাড়ি জমানো শূরা সদস্যবৃন্দের শূন্য স্থানগুলোতে অন্য হযরতদের স্থলাভিষিক্ত করা হোক। সেমতে আল্লাহর ফয়সালায় রায়ভেন্ড ইজতিমায় সেই শূন্যপদগুলো পূর্ণতা লাভ করে।

বর্তমানে যেই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, মেহনতের মাঝে যেই অচলাবস্থা ও চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, দুনিয়ার বিভিন্ন মারকাযে দুটি বিপরীত মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার জনবল গড়ে উঠার কারণে যেই বিবাদ, বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, এই যাবতীয় সমস্যার একমাত্র কারণ হলো, মজলিসে শূরা মেনে না নিয়ে নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা।

হযরতওয়ালা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, পৃথিবীর যেসকল প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসায় মজলিসে শূরা রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই ওই সকল প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসার তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে এবং তুলনামূলক অধিক খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছে, যেখানে শূরাভিত্তিক নিযাম নেই। তদ্রূপ যেসকল প্রতিষ্ঠানে শূরাভিত্তিক পরিচালনা পরিষদ রয়েছে এবং শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানি ও হাকিমুল উম্মাত হযরত থানভি রহ. এর ভাষায়, যেই মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কর্তৃত্ব পেয়ে কাজ করছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিঃসন্দেহে সার্বিক বিবেচনায় সুশৃঙ্খল প্রশাসন, স্বস্তিদায়ক পরিবেশ ও আইনের নির্বিঘ্ন প্রয়োগ রয়েছে। শূরার বরকত থেকে শূন্য প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের সবাইকে মহান আকাবির রহ. এর রেখে যাওয়া পদচিহ্ন অনুসরণ করে এবং তাঁদের রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসারে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের সঙ্গে দ্বীনের খেদমত করার তাওফিক দেন তাহলে অবশ্যই কোনো ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পাবে না।

ইসলামের শত্রুরা কীভাবে এই দাওয়াতি মেহনত ধ্বংস করার, নিদেনপক্ষে এই মেহনতের যতবেশি সম্ভব ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কিত একটি ঘটনা নিবেদন করছি।

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. তখন তাঁর জীবনের সর্বশেষ মেওয়াত-সফরে ছিলেন। আমি অধমও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ ও পরম সৌভাগ্য যে, হযরতজি রহ. এর জীবনের শেষ সাত-আট বছরের সবগুলো দেশি-বিদেশি সফরে একজন খাদেম

হিসেবে সঙ্গে থাকার তাওফিক পেয়েছি।

মেওয়াতের সেই সফরে আমি দেখতে পেলাম, হযরতজি রহ. মাগরিব নামাযের পর নফল ইত্যাদি থেকে ফারেগ হয়ে প্রচণ্ড পেরেশান অবস্থায় কেবলার দিকে মুখ করে বসে আছেন। মুখে কোনো শব্দ নেই। বিলকুল খামুশ। সাধারণত এ ধরনের নির্জন পরিবেশে আমি এগিয়ে এসে হযরতের খেদমতে এক-দু' কথা নিবেদন করি। সেদিন হযরতকে প্রচণ্ড চিন্তামগ্ন দেখে আমি এগিয়ে গেলাম এবং প্রথমে শারীরিক সুস্থতা ও মেজায-মর্জি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। উত্তরে হযরত বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।' কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে আমি পুনরায় মন-মেজায সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তখন তিনি একটি হিম-শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে এ উত্তর দিলেন, 'ভাই, ইসলামের শত্রুরা ও তাবলীগের বিদ্বেষীরা এখন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের উঁচু সারির সদস্যদের পরস্পরে ঝগড়া-মতনৈক্য বাধিয়ে দেবে। যেন মেহনত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিষয়টি নিয়ে আমি এখন প্রচণ্ড চিন্তিত।'

বর্তমানে আমি আমার চোখের সামনে যেই হৃদয় বিদারক ও বেদনাদায়ক পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি তা দেখে অনুমান করছি যে, আল্লাহ তাআলা হযরতজি রহ.কে কতটা দূরদর্শী ভাবনাশক্তি দিয়েছিলেন!

আমার মত লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা সমাজের চোখে মূল্যহীন; কিন্তু এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে যারা নিজেদের জান, মাল ও গোটা জীবন উৎসর্গ করেছে, তারা এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে পূর্ণ আশ্বস্ত ও প্রশান্ত যে, চলমান সংকটে শেষ পর্যন্ত বিজয়ের হাসি সেই আলমি শূরাই হাসবে, যা নববি ফয়সালা ও অভিপ্রায় অনুসারে গঠিত হয়েছে। যারা এই নববি ফয়সালা ভাঙতে আসবে, তারাই চরম ব্যর্থ হবে। কারণ, বর্তমান পৃথিবীতে যেখানেই যতটুকু আলো আছে, তা স্রেফ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের কল্যাণে আছে; অন্য কারো নামে নয়।

দুআ করুন, মহান আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে মানসিক ও চৈন্তিক বক্রতা থেকে নিরাপদ রাখেন। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে ও মেহনতে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই মহান মনীষীগণ সারাজীবন সাধনা করে যেই মানহাজ দাঁড় করিয়েছেন, সেই মানহাজ থেকে বিচ্যুত হলে লাঞ্ছনা, অবমাননা ও অকল্যাণের পাহাড় ভেঙে পড়বে। যেই দৃশ্য আজ আমি, আপনি ও সারা পৃথিবী অবলোকন করছে। কারণ হলো, কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।' [সূরা নূর : ৬৩]

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে এবং তাঁর সকল বুযুর্গানে দ্বীনের ক্রোধ থেকে পানাহ চাই।

-নেক দুআর প্রত্যাশী,
সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি
নাতি, শায়খুল হাদিস যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ.
২ শাওয়াল ১৪৩৭ হি. / ৮ জুলাই ২০১৬ ঈ.

আলমি শূরার শূন্য পদগুলো পূরণ ও সম্প্রসারণের পক্ষে সারা পৃথিবীর মেহনতের সাথী ও মুখলিস যিম্মাদারদের তরফ থেকে যেভাবে সমর্থন ও সহমত জানানো হয়েছে এবং পৃথিবীর অজস্র রাষ্ট্র থেকে যেভাবে সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা কোনো ধরনের অতিরঞ্জন ছাড়াই হাজারসংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। সেই সমর্থন ব্যক্তকারীদের নামই এ কথার নিশ্চয়তা প্রদানে যথেষ্ট যে, তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

আলমি শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হযরতের আজীবনের মামুল

আলমি শূরা সম্পর্কে এই বিশদ আলোচনার অধীনে একটি তথ্য পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপন করা জরুরি মনে করছি। তাহলো, মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. সেই আলমি শূরার প্রতি শুধু মৌখিক সম্মানই দেখাননি; বরং তিনি সর্বোতভাবে সেই শূরার প্রতিটি সিদ্ধান্তের ওপর আমলও করতেন।

নিম্নে আমরা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি–

১. শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাইআত স্থগিত করা

শূরা সর্বপ্রথম এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এখন থেকে নিযামুদ্দিন মারকাযে বাইআতের সিলসিলা বন্ধ থাকবে। কাজেই যেসকল সাথী যেই মাশায়েখ বা আকাবিরের কাছে বাইআত হতে চান, তারা তাঁদের নিজ নিজ অবস্থানস্থলে গিয়ে এই সিলসিলা জারি রাখতে পারেন।

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.-কে আল্লাহ তাআলা রহমতের প্লাবনে সিক্ত করুন। তিনি তৃতীয় হযরতজি রহ. এর ইনতিকালের পর আলমি শূরার এই সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাইআত করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অথচ ওই যুগের অসংখ্য আকাবির বাইআত হতে ইচ্ছুক তালিবদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্যে হযরতের শরণাপন্ন হওয়ার ও হযরতের সঙ্গে রূহানি সম্পর্ক গড়ে তোলার নসিহত করতেন। কিন্তু হযরত রহ. এই মামুল বানিয়ে নিয়েছিলেন যে, যখন কেউ তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার জন্যে জোরাজুরি করত তখন তিনি এ কথা বলতেন যে, 'আব্বাজান রহ. এর বাইআতই যথেষ্ট। আপনি এখন তাঁর বাতলানো মামুলাতের ওপর আমল করুন। হ্যাঁ, কোনো কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

আমি নিজে তাঁর মজলিসে অজস্রবার এ দৃশ্য দেখেছি যে, দাওয়াতের অনেক সাথী ও উলামায়ে কেরাম তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার জন্যে উপর্যুপরি অনুরোধ করতো; কিন্তু তিনি এ কথা বলে অসম্মতি জানিয়ে দিতেন যে, 'শূরার পক্ষ থেকে নিষেধ রয়েছে। যেই শূরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মাঝে আমি নিজেও আছি। কাজেই আমি নিজেই আবার বাইআত করিয়ে কীভাবে সেই ফয়সালা অমান্য করি'!

অনেক ভাই সরাসরি বা চিঠির মাধ্যমে আমাকে দিয়ে তাঁর কাছে সুপারিশ করিয়েছেন; কিন্তু হযরত রহ. জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল ছিলেন।

এক্ষেত্রে আমি সর্বপ্রথম সুপারিশ করেছিলাম মাওলানা মুহাম্মদ সুলায়মান ঝাঞ্ঝি ভাইয়ের জন্যে। তিনি আমাকে বারবার জোরাজুরি করে তার জন্যে সুপারিশ করার অনুরোধ করেন; কিন্তু হযরত রহ. শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে পরিষ্কার অমত জানিয়ে দেন।

সুরাটের সম্ভ্রান্ত পরিবার মুনিয়ার বংশের দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জনাব আলহাজ শেখ মাহমুদ মুনিয়ার ও জনাব শেখ আবদুল হাফিয মুনিয়ার সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতে পেরেছি যে, এ দু'জনও হযরত রহ. এর কাছে বাইআত হওয়ার জন্যে প্রবল অনুনয়-বিনয় করেছিলেন; বরাবরের মত এদেরকেও হযরত শূরার সিদ্ধান্তের ওজর পেশ করে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। হযরতের বাইআতের অস্বীকৃতির কথা প্রফেসর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব তাঁর পত্রে লিখেছেন–

> আমার মনে পড়ে, একবার আমি নির্জনে মরহুম মৌলভি যুবায়র সাহেবের কাছে আবেদন করেছিলাম, 'আপনার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বাইআত করে নিন। আমি পূর্বে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর কাছে বাইআতাবদ্ধ ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. এর কাছে বাইআত হয়েছি। এখন তাঁর ইজাযতপ্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে স্রেফ আপনি একাই আছেন। কাজেই আপনি আমাকে বাইআত করে নিন, যেন আমি শূন্য না থাকি।'
>
> কিন্তু আমার সেই অনুরোধে মৌলভি যুবায়র রহ. সায় দেননি। অথচ ওই মুহূর্তে সেই হুজরায় শুধু আমরা দু'জনই ছিলাম। আমার অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেন, 'হযরতের ইনতিকালের পর শূরা মাশওয়ারা করে কোনো কল্যাণ সামনে রেখে বাইআত স্থগিত রেখেছে। আমি সেই শূরার একজন সদস্য। ওই মাশওয়ারায় আমি শরিক ছিলাম। শূরার সেই সিদ্ধান্তের কারণে বাইআত স্থগিত করে দিয়েছি। শূরার সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা ঠিক হবে না। তুমি হযরতের কাছে বাইআত হয়েছিলে। হযরত পড়ার জন্যে যেই অযিফা দিয়েছেন, তা আদায় করতে থাকো। অবশ্য এক্ষেত্রে কোনো রাহবারি চাইলে আমি হাজির আছি। কিন্তু শূরার মাশওয়ারার বিরোধিতা করে বাইআত নেওয়া আমার জন্যে সমীচীন হবে না।'
>
> আমি যদ্দূর জানি, তিনি আজীবন কাউকে বাইআত করেননি। খুব দ্রুত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

২. শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের আরেকটি নজির

শূরার আরেকটি বড় ধরনের সিদ্ধান্ত ছিল, 'এখন থেকে এই আলমি মেহনতে কোনো আমির থাকবে না। সব জায়গায় এই মেহনত জামাতি শূরার বুনিয়াদের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।' মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.কে আল্লাহ তাআলা রহমতের প্লাবনে সিক্ত করুন। তাঁর হাশর-নশর তাঁর মহান পিতৃপুরুষদের সঙ্গে করুন। তিনি শূরার এই সিদ্ধান্তকে পূর্ণ হাসিমুখে, আন্তরিক সৌহার্দ্যের সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নিজের জীবনের শেষ বিশ বছরের মুবারক মুদ্দতে তিনি সবসময় নিজেকে জামাতি ফয়সালা ও সর্বসম্মিলিত মাশওয়ার অনুগত বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে নিষ্কলুষ রেখেছেন। যার ফলে এই দাওয়াতি মেহনত গোটা দুনিয়াতে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়নি। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর ওপর মহান আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও করুণা যে, তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর আরো বিশ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ মুদ্দতে মেহনত আলমি শূরার অধীনে পরিচালিত হয়েছে। ইতিহাসের এই প্রলম্বিত সময়ে একটিবারের জন্যেও তিনি আমির হওয়ার খায়েশ কারো কাছে ব্যক্ত করেননি। বা কোনো ধরনের হিলা-বাহানা-কৌশল অবলম্বন করে নিজের আমিরত্বের দাবি তোলেননি।

এক্ষেত্রে তিনি তাঁর মহান দু' অগ্রপথিক মনীষা দ্বিতীয় হযরতজি রহ. ও তৃতীয় হযরতজি রহ. এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। কারণ, হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের ভাষায়, 'এ দু' হযরতজি যদিও সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আমির ছিলেন; কিন্তু কখনই তারা নিজেদেরকে আমির দাবি করেননি। কখনই কোনো কথা আমিরসুলভ ঢঙে বলেননি। কখনই নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেননি। আমির হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সবসময় নিজেদেরকে মাশওয়ারার অনুগত বানিয়ে রাখতেন। [২৩ যিলক্বদ ১৪৩৭ হি./১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে লেখা চিঠি]

বইয়ের কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে শুধু দুটি উদাহরণ পেশ করলাম, যেখানে শূরার সিদ্ধান্তের প্রতি হযরত রহ. এর পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। নয়তো এ ধরনের উদাহরণের তালিকা খুবই দীর্ঘ।

৩. ফাযায়েলে আমলের মুকাবেলায় মুনতাখাব হাদিস

জামাতে তাবলীগ যেসব উসূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর মাঝে রয়েছে, কালিমায়ে তাইয়্যেবা, নামায, ইলম ও যিকির, ইকরামুল মুসলিমিন, ইখলাসে নিয়্যত ও তাফরিগে ওয়াক্ত।'

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. তাঁর ইনতিকালের কয়েক বছর পূর্বে এই ছয় উসূলের ওপর পৃথক পৃথক আকারে হাদিস সংকলনের কাজ গুরুত্বের সঙ্গে শুরু করেন। তিনি একসঙ্গে কয়েকজন আলেমকে আলাদা আলাদাভাবে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেন যে, তারা যেন প্রচুর তত্ত্ব-তালাশ করে এ সব বিষয়ের হাদিস একত্র করে। তিনি সেই বিষয়গুলোর অধীনে অনেকগুলো শাখা শিরোনামও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত আলেমদের একজন হলেন, মাওলানা আবদুল্লাহ তারেক। যিনি বসতি নিযামুদ্দিনে মুকিম ছিলেন। তাঁকে ইকরামুল মুসলিমিন শিরোনামের অধীনে হাদিস সংকলন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। মেহনতের যেসকল সাথী এই কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত, তারা ভালো করেই জানেন যে, হযরত মাওলানা রহ. এই কিতাব সংকলন করার উদ্যোগ ও পরিকল্পনা এ উদ্দেশ্যে নিয়েছিলেন যে, যেন এই কিতাবের অনেকগুলো কলমি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন মারকাযে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই মারকাযগুলোর মুকিম উলামা হযরত এই পাণ্ডুলিপি থেকে ইসতিফাদা করতে পারেন (উপকৃত হতে পারেন)। যার কারণে এ গ্রন্থটি যেমন হায়াতুস সাহাবা, আমানিয়ুল আহবার প্রভৃতির মত দ্বিতীয় হযরতজি রহ.-এর ২২ বছরের ইমারতের যুগে প্রকাশিত হয়নি, তদ্রূপ তৃতীয় হযরতজি রহ. এর ৩২ বছরের সুদীর্ঘ ইমারতের যুগেও আলোর মুখ দেখেনি।

কিন্তু একটি বিশেষ মানসিকতা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৪২১ হি. মুতাবেক ২০০০ সালে উরদু, আরবি-সহ বিশ্বের ডজনখানেক ভাষায় ও অনেকগুলো দেশে প্রচণ্ড দ্রুততার সঙ্গে কিতাবটি প্রকাশ করা হয়। এ জাতীয় পদক্ষেপের ফলে ওই সব গোষ্ঠী ও শ্রেণি– যারা কোনোদিন শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. এর মুহাদ্দিসি মর্যাদা ও ফাযায়েলে

আমল গ্রন্থের দিগন্তবিস্তৃত সুখ্যাতি[৬] হজম করতে পারেনি, যেই গোষ্ঠী ও শ্রেণি চিরকাল দেওবন্দ ও দেওবন্দের মর্যাদাকে বিষমাখা দৃষ্টিতে দেখতো, তাদের ঘরে ঘরে উল্লাসের মচ্ছব শুরু হয়ে যায়।

এখন যেসব সাধারণ সাথী জামাতে বেরোচ্ছে, তাদের কাছ থেকে; বড় বড় ইজতিমায় উপস্থিত সাধারণ জনগণের কাছ থেকে বড় গলায় এ অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন অবশ্যই তাদের তালীমের মাঝে এই মুনতাখাব হাদিস পড়ে এবং দেশে থাকুক, কিবা বিদেশের সফরে বের হোক– সর্বাবস্থায় যেন এ কিতাবটি নিজের সঙ্গে রাখে।

এতো ঢাক-ঢোল আর হম্বিতম্বি পেটানোর পরও এখন পর্যন্ত এ কিতাবটি এতোটা মজলুম হয়ে আছে যে, এখন পর্যন্ত কিতাবটির তালীমের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে মানসিক টানাপোড়েন ও চৈন্তিক বিভাজনের কারণে কোনো নির্দিষ্ট তরতিব চূড়ান্ত হয়নি। প্রথমদিকে এলানে বলা হতো, প্রথমে ফাযায়েলে আমল পড়ে শেষে কিছু সময়ের জন্যে এ কিতাব থেকেও তালীম হবে। এরপর দ্বিতীয় রুখ আসে, একদিন ফাযায়েলে আমল থেকে তালীম হবে, পরদিন মুনতাখাবের তালীম হবে। এখন তৃতীয় রুখ জারি হয়েছে, সকালে মুনতাখাবের তালীম হবে, সন্ধ্যায় ফাযায়েলের তালীম হবে। আল্লাহ মালুম, আগামীতে চতুর্থ রুখ কী আসবে?

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সকালে মুনতাখাব থেকে ও সন্ধ্যায় ফাযায়েলের তালীম, এই তরতিব জারি করার আসল উদ্দেশ্য হলো, যেসব জামাত আল্লাহর রাস্তায় বের হয় বা ইজতিমাগুলোতে তালীমের আসল ও দীর্ঘ সময় হলো, সকাল। মেহনতের সাথীগণ সকালের তালীমে অংশগ্রহণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর বিপরীতে সন্ধ্যার সময়টি সর্বদিক বিবেচনায় গুরুত্বহীন ও সংক্ষিপ্ত।

মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এ কিতাবটি যদিও একদিকে বেশ দামী ও মূল্যবান; কিন্তু অন্যদিকে এ কিতাবটি ক্রমশ ঝগড়া ও সংঘর্ষের কারণ হতে চলেছে। এই কিতাবের কারণে মেহনতের সাথীদের মাঝে চরম বিভাজন ও ফেতনা বেড়েই চলেছে।

এর প্রথম কারণ হলো, যারা খোলা চোখে মেহনতের সঙ্গে জড়িত, তাদের কাছে এ কিতাব রচনার প্রেক্ষাপট স্পষ্ট। তারা বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, এ কিতাবটি রচনা করা হয়েছে স্রেফ শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মদনি রহ. এর ইলমি মর্যাদা ও মুহাদ্দিসানা শানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে। যেন এর মাধ্যমে মেহনতকে দু'টি পৃথক শিবিরে ভাগ করা যায় এবং মেহনতের সাথীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা যায়।

দ্বিতীয় কারণ হলো, মেহনতের মাঝে এই কিতাব জারি করার ব্যাপারে মেহনতের পুরনো সাথী, যিম্মাদার, মুবাল্লিগ ও দাঈ ভাইদের সঙ্গে কোনো ধরনের পরামর্শ করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সবার মাঝে ঐক্যমতের পরিবেশ গড়ে তোলা হয়নি। যার কারণে নিযামুদ্দিন মারকাযের মুকিম সমস্ত খাস সাথী, যথা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান রহ. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, প্রফেসর মুহাম্মদ হাসান সাহেব, জনাব আলহাজ নাদের খান সাহেব, জনাব আলহাজ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব, জনাব প্রফেসর সানাউল্লাহ সাহেব প্রমুখসহ দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা অসংখ্য খাস সাথী এই কিতাব থেকে পুরোপুরি বিমুখ ও বিচ্ছিন্ন। এ সকল হযরত কোনো সময়, কোনো সুরতেই তাবলীগের কোনো জামাতে বা ইজতিমায় এ কিতাবের তালীমের একক সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাননি এবং দেশ-বিদেশের অনুষ্ঠিত বড় বড় ইজতিমায় তাঁদের নিজেদের বয়ানে এ কিতাবের তালীমের পক্ষে একটি শব্দ বা একটি বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি; বরং প্রতিটি ছোট-বড় ইজতিমা থেকে শুরু করে নিযামুদ্দিন মারকাযে অনুষ্ঠিত মুলকি (দেশি) ও গায়রে মুলকি (আন্তর্জাতিক) জোড়ে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ণ দলিল-প্রমাণাদি সহকারে জোরালো কণ্ঠে ফাযায়েলে আমলের স্থানে এই কিতাব চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা জানিয়ে আসছেন।

এখানে আমি আমার দিনলিপির ডায়রি থেকে শা'বান ১৪২৭ হি./ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঈ. তারিখে অনুষ্ঠিত জোড়ের এক টুকরো তথ্য তুলে ধরছি। যা পড়ে পাঠকবর্গ খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, যেসকল সাথী হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. বা তাঁরও আগে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর আমল থেকে এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের

---

৬. এখানে আমি একজন জার্মান প্রাচ্যবিদের একটি গবেষণার উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি, যিনি এ দাবি করেছেন যে, বর্তমান সময়ে পুরো দুনিয়াতে দেওবন্দ ও দেওবন্দি মতাদর্শের উত্থান ও বিস্তৃতি এককভাবে ফাযায়েলে আমলের কল্যাণে হয়েছে।

কাজেই পাঠকবর্গই এখন সিদ্ধান্ত নিন, কোন গোষ্ঠী ও কোন বলয়ের সন্তুষ্টি হাসিল করার স্বার্থে ফাযায়েলে আমলের স্থানে মুনতাখাব আহাদিসকে চয়ন করা হলো!?

সঙ্গে জড়িত, সেই কুদামা বা পুরনো সাথীগণ এই মেহনতের নাজুক ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার কারণেই তারা এই কিতাব অর্থাৎ মুনতাখাব আহাদিসকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এটিকে ফাযায়েলে আমলের পরিবর্তে নিয়ে আসার উদ্যোগের বিরুদ্ধে কতটা জোরালোভাবে, কতটা তীব্রতার সঙ্গে বিরোধিতা জানিয়ে আসছেন। আমি সেদিনের দিনলিপিতে লিখেছিলাম,

"১৮ শাবান ১৪২৭ হি./ ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

এদিন বিকেল চারটায় সাহারানপুর থেকে রওয়ানা হয়ে নিরাপদে রাত ৯টায় মারকাযে পৌঁছি। আজকাল এখানে হিন্দুস্তানের পুরনো সাথীদের জোড় চলছে। জানতে পারলাম, সাহেবযাদা হায়াতুস সাহাবার তালীমের পূর্বে জোরালো ভাষায় উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে মুনতাখাব আহাদিসের আনুষ্ঠানিক তালীমের উৎসাহ দিচ্ছে। যার ফলে বাইরে থেকে আগত পুরনো সাথীদের মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, সবাই মিলে তাকে জানাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাশওয়ারার মাঝে সিদ্ধান্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এর উৎসাহ দেবেন না।

সেমতে এ নিয়ে কথা বলার জন্যে ভাই ফারুক সাহেব, ডক্টর সানাউল্লাহ, ভাই খালেদ সিদ্দিকি, মাওলানা ইবরাহিম দেওলা, মাওলানা আহমদ লাট সাহেব প্রমুখ একত্র হয়ে ঈশার নামাযের পর মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে তাঁদের গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরেন।

পরদিন ৯ শাবান বুধবার মাশওয়ারার পর এ সকল হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর উপস্থিতিতে সাহেবযাদা সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সবাই এই কিতাব জারির বিরুদ্ধে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন।

সাহেবযাদা প্রথম দিকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। শক্ত ও রুক্ষ শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু সবার সম্মিলিত অভিমতের সামনে শেষ পর্যন্ত চুপ হয়ে যান। তখন সিদ্ধান্ত হয়, সামনের রায়ভেন্ড ইজতিমায় বিষয়টি নিয়ে সম্মিলিতভাবে চিন্তা করা হবে।

মুনাজাতের পর দুপুর একটায় আমি দিল্লি থেকে রওয়ানা হয়ে মাগরিবের আগে আগে সাহারানপুর পৌঁছে যাই।

একই ধারাবাহিকতায় ১৪২৭ হিজরি/২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হজের সফরেও দাওয়াত ও তাবলীগের পুরনো সাথীদের সঙ্গে সাহেবযাদা মাওলানা সাদ সাহেবের মুনতাখাব আহাদিস নিসাবভুক্ত করা-না করা নিয়ে প্রচুর কথা কাটাকাটি হয়। ওই সময় একাধিকবার পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্তও হয়েছিল। সাহেবযাদার প্রবল ইচ্ছা ছিল, তাৎক্ষণিকভাবে কিতাবটিকে নিসাবের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সর্বত্র পড়া হবে। এর বিপরীতে অন্যসব হযরত এককভাবে ফাযায়েলে আমলের ওপরই জোর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিতাবটি সম্পর্কে মেহনতের পুরনো সাথীদের মনোভাব

এ সম্পর্কে গত কয়েক মাস ধরে আদান-প্রদান হওয়া অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি থেকে পাঁচটি চয়িতাংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

১.

প্রথম চয়িতাংশ তুলে ধরা হচ্ছে সেই দীর্ঘ চিঠি থেকে, যা নভেম্বর ২০১৫ / মুহাররম ১৪৩৭ হিজরিতে মাওলানা ইসমাঈল গোধরা, ভাই ফারুক ব্যাঙ্গলোর, প্রফেসর সানাউল্লাহ আলিগড়, ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব আলিগড়, প্রফেসর আবদুর রহমান মাদ্রাজ, মাওলানা আবদুর রহমান রুয়ানা, মুম্বাই– এই ছয়জন পুরনো সাথীর স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। সেই চিঠির মাঝে তারা এ ভাষায় অভিযোগ জানিয়েছেন,

'কৌশলে কোনো ধরনের মাশওয়ারা না করে মারকাযের স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে মুনতাখাব আহাদিসকে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

২.

দ্বিতীয় চয়িতাংশ তুলে ধরা হচ্ছে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের একটি চিঠি থেকে। যিনি বিগত পঞ্চাশ (৫০) বছর ধরে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ও মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ.-কে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। দেশ-

বিদেশের সফরে সঙ্গী হয়েছেন। নিযামুদ্দিন মারকাযের মুকিম যিম্মাদার। তিনি তাঁর ২৩ যিলকদ ১৪৩৭ হি. / ২৭ আগস্ট ২০১৬ ঈ. তারিখে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছেন,

> **'মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. কখনো ইঙ্গিতেও এই কিতাব তালীম করার কথা বলেননি। এখন ধীরে ধীরে 'ফাযায়েল আমাল' উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে 'মুনতাখাব' চালু করার চেষ্টা চলছে।'**

৩.

তৃতীয় চয়িতাংশ সেই চার পাতার দীর্ঘ চিঠি থেকে নেওয়া হয়েছে, যা এই কিতাব সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তলহা কান্ধলভি আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে দেশ-বিদেশের তাবলীগি মেহনতের যিম্মাদার সাথীদের খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

> **'অল্প কয়েক দিন আগে আমি উমরার সফর থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলাম, আমার নামে প্রচুর চিঠি এসেছে। সেই চিঠিগুলোর মধ্য হতে বেশ কিছু চিঠিতে লেখা ছিল যে, তাবলীগের যিম্মাদারদের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা ও তাগাদা জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাবলীগের সমস্ত জামাত ও মসজিদের তালীমে ফাযায়েলে আমলের স্থানে মুনতাখাব আহাদিস পড়া হবে। যার ফলে এখন বিভিন্ন জায়গায় তাৎক্ষণিক মুনতাখাব আহাদিসের তালীমও শুরু হয়ে গেছে। যেসকল এলাকায় সেই যিম্মাদারদের প্রভাব ও দাপট বেশি, সেখানে শুধু মুনতাখাব আহাদিস কিতাবেরই তালীম হচ্ছে। ফাযায়েলে আমলকে শতভাগ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেননা তাদেরকে কিছু কিছু মারকাযি প্রতিষ্ঠান থেকে ইঙ্গিতে এ নির্দেশই পাঠানো হয়েছে।**
>
> **আমার অন্তর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে, কোনো মারকাযি যিম্মাদার এতোদিনের নিসাবি কিতাব ফাযায়েলে আমল ছুড়ে ফেলে, তার স্থানে মুনতাখাব আহাদিসের তালীম জারি করার নির্দেশনা জারি করবে!**
>
> **দাওয়াত ও তাবলীগের কিছু সাথী এভাবে তাদের নিজেদের বড়দের নির্দেশনা মেনে বা তাদের ইঙ্গিতে যেভাবে ফাযায়েলে আমল ছুড়ে ফেলছে আর তার স্থানে মুনতাখাব আহাদিসকে স্থান দিচ্ছে, তাদের সেই কর্মকাণ্ডের ওপর আমার প্রবল আপত্তি রয়েছে।**
>
> **দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে যেসব সাথী বের হন, তাদের দ্বীনি ও ইলমি প্রশিক্ষণের জন্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. একটি বুনিয়াদি নিসাব তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অনেক জোরাজুরি করে হযরত শায়খুল হাদিস রহ.-এর মাধ্যমে ফাযায়েল সম্পর্কিত কিছু পুস্তিকা সংকলন করান। তাঁর সেই উদ্যোগের মাঝে কী পরিমাণ ইখলাস ছিল, তা আল্লাহই ভালো জানেন। যার ফলে আল্লাহ তাআলা এই কিতাবকে অস্বাভাবিক মাকবুলিয়াত দান করেছেন। এই কিতাব অসংখ্য অগণিত মানুষের জীবনে বিপ্লব এনেছে।**
>
> **মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর দু' স্থলাভিষিক্ত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. ও মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ.ও ফাযায়েলের এই কিতাবগুলোর তালীম উপকারী মনে করেছেন। তারা এ কিতাবের ওপর কোনো ধরনের আপত্তি তোলেননি। বরং কারো পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি উঠলে তারা সুন্দর ভাষায় জবাব দিয়েছেন। কারণ, এ দু' হযরতের দৃষ্টিতেও এ কিতাব তাবলীগের বুনিয়াদি নিসাবের স্তরে ছিল।**
>
> **মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. তো তাঁর এক চিঠিতে হযরত শায়খুল হাদিস রহ. কর্তৃক সংকলিত ফাযায়েলের এই কিতাবগুলোর নাম লেখার পর পরিষ্কার শব্দে এ কথাটি লিখে দিয়েছিলেন যে, 'স্রেফ এই কিতাবগুলোই ইজতিমায়ি তালিমে পড়া হবে ও শোনা হবে।'**
>
> **এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গে জড়িত সাথীদের জন্যে ফাযায়েলের এই কিতাবগুলো শুধু বুনিয়াদি কিতাব-ই নয়; বরং বুনিয়াদি উসূলও বটে। এই কিতাব থেকে সরে আসা বা এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা করা কোনোভাবেই সমীচিন হবে না। এ ধরনের কাজ করলে তা নিজেদের বুনিয়াদি উসূলের লঙ্ঘন হবে; বরং আমাদের আকাবির রহ. এই মেহনতকে যেই বুনিয়াদের ওপর রেখেছেন এবং যেই বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, তার ওপর এক ধরনের আস্থাহীনতা হবে।'**

হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.-সহ সকল আকাবির হযরত 'মুনতাখাব আহাদিস' কিতাবের কথা জানতেন। যদি এ কিতাবটিও ইজতিমায়ি তা'লীমে পড়া মুনাসিব হতো তাহলে

তাঁদের জীবদ্দশাতেই এই ওপর আমল বাস্তবায়ন শুরু হতো।

৪.

চতুর্থ চয়িতাংশ তুলে ধরছি মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর লেখা সেই দীর্ঘ চিঠি থেকে, যা তিনি মারকায নিযামুদ্দিনের জন্যে গঠিত একটি স্থানীয় মজলিসে শূরায় পেশ করেছিলেন। সেই চিঠির মাঝে তিনি[৭] মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি এই মনোভাবের ওপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচল-অনড় ছিলেন। এমনকি এই মনোভাবের জন্যে চতুর্পাশ থেকে উড়ে আসা চাপ, ধমকিমিশ্রিত কড়া কথা ও ঝাঁঝালো মন্তব্যভরা চিঠিগুলো ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

কিছু কিছু জীবনীকার কিতাবটি সম্পর্কে হযরত যুবায়রুল হাসান রহ. এর যেই অবস্থান তুলে ধরেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে ভুল তথ্য ও নির্জলা মিথ্যা। মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর সেই চিঠির চয়নিকা তুলে ধরছি,

> **'অধমের কাছে মুনতাখাব আহাদিসের মাসআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মেহনতের সাথীরা এর কারণে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। কোনো ধরনের মাশওয়ারা ব্যতিরেকে বিভিন্ন ভাষায় এর তরজমা করানো হয়েছে। এখন এই চেষ্টা চলছে যে, জামাতে ও তালীমের হালকায় যেভাবে ফাযায়েলে আমল পড়া হয়, ঠিক সেভাবেই যেন মুনতাখাব আহাদিসও পড়া হয়। আমার কাছে এ ব্যাপারে অজস্র চিঠি আসছে এবং মেহনতের অসংখ্য সাথী মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করছে যে, এটি পড়া হবে, কি হবে না। বিষয়টি নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। খোদ আমাদের এখানে ঘরের ভেতর কোনো ধরনের মাশওয়ারা ও সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে এই কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।'**
>
> **'এ কারণে অধমের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, উমুমি তালীম শুধু ফাযায়েলে আমলেরই হবে, যেমনটি বিগত ৭০ বছর ধরে হয়ে আসছে। আর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাঝে মুনতাখাব আহাদিসকে রাখা যেতে পারে।'**

৫.

পঞ্চম মনোভাব (বরং এটিকে এক ধরনের ক্ষমাপত্র বলা যেতে পারে) লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মদ বিলাল করাচি। তিনি প্রথম দিকে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে বা নিজের সরলতার কারণে পরিস্থিতির গভীরে না গিয়ে মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু যখনই এর ক্ষতি ও পর্দার আড়ালের পরিকল্পনা তার সামনে চলে আসে তখন তিনি তৎক্ষণাৎ একটি 'ক্ষমাপ্রার্থনামূলক চিঠি' লিখে দাওয়াতের সাথীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন।

তার লেখা সেই রুজুনামা হোয়াটস-অ্যাপের মাধ্যমে সারা দুনিয়াতে ভাইরাল হয়ে গেছে। সেখান থেকে নকল করা হচ্ছে-

> **'মৌলভি সাদ কান্ধলভি সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায়, তার ইঙ্গিতে আমি অনেকগুলো ভুল কাজ করেছি। এগুলোর মধ্য হতে অন্যতম একটি ভুল হলো, 'মুনতাখাব আহাদিস' কিতাবের সংকলন ও বিন্যাসদানের জন্যে আলেমদের যেই জামাত গঠন করা হয়েছিল, আমি তাদের সঙ্গ দিয়েছিলাম।**
>
> **মৌলভি সাদ ২০০০ সালে রায়ভেন্ড মারকাযে না এসে দিল্লি থেকে সরাসরি করাচিতে চলে আসে। যার কারণে হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, 'তার প্রথমে রায়ভেন্ড এসে মাশওয়ারা করে কাজ করা দরকার ছিল।' আমি ওই সময় হাজি সাহেবের অসন্তোষের কারণ বুঝতে পারিনি।**
>
> **যখন মুনতাখাব আহাদিসের অনুবাদ সম্পন্ন হয় তখন এ প্রশ্ন উঠে যে, এই কিতাবের সংকলক হিসেবে উলামায়ে কেরামের সেই জামাতের কথা ছাপা হোক, যারা এর অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। কেননা এটাই তো বাস্তব। কিন্তু প্রচণ্ড রকমের হতবাক হলাম যখন মৌলভি সাদ সাহেবের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করা হয় তখন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, এই কিতাবটি আমার দিকেই সম্বন্ধিত হবে। (অনুবাদের) লেখক ও সংকলক হিসেবে আমার নামই আসবে। লেখালেখির জগতে এটি কত বড় অসততা, তা আপনারাই অনুমান করে নিন।**
>
> **তখন আমরা হাজি সাহেবের অসন্তুষ্টির কারণ জানতে পারি। বুঝতে পারি, আসলেই তিনি কতটা দূরদর্শী!**

---

[৭]. আমার দিনলিপির ডায়েরির তথ্যানুসারে আমি সর্বপ্রথম মারকায নিযামুদ্দিনের মিম্বার, মিহরাব ও আলমারিতে 'মুনতাখাব আহাদিস' কিতাবের উপস্থিতি দেখতে পাই ১ লা শাবান ১৪২১ হি. / ২৯ অক্টোবর ২০০০ ঈ. তারিখে নিযামুদ্দিনে এসে।

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি। তা হলো, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ছয় নম্বর সম্পর্কিত যেই হাদিসগুলো একত্র করেছিলেন, সেগুলো খুবই অল্প ছিল। অধিকাংশ হাদিস উলামায়ে কেরামের এই জামাত অন্তর্ভুক্ত করে ছয় নম্বর মুকাম্মাল (সম্পূর্ণ) করে। কাজেই এই কিতাবটির সংকলক হিসেবে যেভাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ.-এর নাম বলা হচ্ছে, সেটাও একটি পরিষ্কার মিথ্যা। আফসোস, আমরা ওই সময় বুঝতে পারিনি যে, আমরা উম্মতকে কত বড় ফেতনায় ফেলতে যাচ্ছি! আমাদের চোখ তখন খোলে যখন হাজি সাহেব এই কিতাবকে আমাদের ইজতিমায়ি তালিমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবের ওপর পুরোপুরি অসম্মতি ব্যক্ত করেন। আসলেই তিনি গভীর দূরদর্শী মনীষা। উম্মতকে এই ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বংশের উত্তরাধিকারী হয়েও মৌলভি সাদ সাহেব আমানত ও হিফাযতের ক্ষেত্রে এত বড় অসততার পরিচয় দিলেন যে, তিনি 'মুনতাখাব আহাদিস' এর আরবি সংকলনের ঘরেও নিজের নাম বসিয়ে দিলেন। খ্যাতির এ পরিমাণ ক্ষুধা! তাওবা, তাওবা। আসতাগফিরুল্লাহ। যারা তার বয়ান শোনেন, বিশেষ করে যেসমস্ত উলামায়ে কেরাম তার বয়ান শুনেছেন, তারা ইতোমধ্যে তার ইলমস্বল্পতার বিষয়টি অনুভব করতে পেরেছেন।

২৯ অক্টোবর বাংলাওয়ালি মসজিদে তিনি তার এক বয়ানে বলেছেন, 'হিদায়াত আল্লাহর হাতে নয়'। নাউযুবিল্লাহ। এটি পরিষ্কার আকিদাবিরোধী বয়ান। এ হল তার ইলমি যোগ্যতার চিত্র!

মাত্র কয়েক দিন আগে মুহতারাম হাজি সাহেব শূরা সম্পর্কে সকল পুরনো সাথীদের অভিমত নিয়ে ফয়সালা জানিয়েছেন; কিন্তু মৌলভি সাদ সাহেব পদলোভ ও স্বার্থান্ধতার কারণে সেই ফয়সালাকেও একটি মারাত্মক বিশৃঙ্খলার মুখে ফেলে দিয়েছেন। তিনি এতোটাই বংশীয় তরফদারির শিকার যে, নিজের অল্পবয়সী ছেলে ইউসুফকেও শূরার মাঝে রাখার জন্যে চাপাচাপি করছেন। তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকল পুরনো সাথী মোটেই একমত নন। হাজি সাহেবও শক্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিজেকে কেউ এতোটা নীচে নামাতে পারে! এমন কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক।

হিন্দুস্তানে ফিরে এসে তিনি সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. এর একটি পুরনো চিঠি নিজের স্বার্থে চালিয়ে দিয়েছেন যে, মাওলানা এ চিঠি তাকে লিখেছিলেন। যা বিলকুল মিথ্যা ও অবাস্তব।

এত বড় মিথ্যা ও প্রতারণাকারী মৌলভি সাদ সাহেবকে কেউ জিজ্ঞেস করুন, 'মুনতাখাব আহাদিস কিতাবটি তো পাকিস্তানের সংকলন ও গ্রন্থায়ন এবং সেটি সর্বপ্রথম পাকিস্তানেই প্রকাশিত হয়। আপনি কেন সেই কিতাবকে ফাযায়েলে আমলের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে চালাতে চাচ্ছেন? আপনি কেন হযরত হাজি সাহেবের সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত নন? উল্টো কেন তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ হলেন? আপনি কি তাবলীগকে আপনার উত্তরাধিকার সম্পত্তি মনে করেন?'

বর্তমান সময়ে মুনতাখাব আহাদিস কিতাব সারা পৃথিবীতে ঝগড়া, মতভিন্নতা ও ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা সবাই অনুতাপ-অনুশোচনা করছি যে, কেন আমরা তার প্রতারণা ও মিথ্যা কথা মেনে এই কিতাব সংকলন করতে গেলাম! আল্লাহ মেহেরবান আমাদের এই ত্রুটি মাফ করুন। এ ধরনের কাজ লেখালেখির জগতে অবশ্যই অনেক বড় অসততা।

সবাইকে সালাম।

–বান্দা মুহাম্মদ বিলাল করাচি

মাওলানা বিলাল করাচির সেই চিঠির সঙ্গে আরো কিছু তথ্য সংযোজন করা সঙ্গত মনে করছি। তা হলো, দিল্লির কিছু হযরত এ কিতাবের মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রাথমিক পর্যায়ে এটিকে নেক কাজ মনে করে নিজেদের জান, মাল ও সময় ব্যয় করে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন। তাদের বক্তব্য হলো, এ কিতাবটির প্রথম পাণ্ডুলিপি খাতার মাত্র ৩০-৩৫ পৃষ্ঠার কলেবর সমৃদ্ধ ছিল। আমরা সেই পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণের স্বার্থে লেমিনেশন করিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন সেখানে অনুবাদের পাশাপাশি মূল বইকে বেশ মোটা বানানো হয়েছে এবং পুরো কিতাব সংকলনের নিসবত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর দিকে করা হচ্ছে।' তাদের দেওয়া এ তথ্য যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এটি জ্ঞানের জগতে অনেক বড় খিয়ানত।

একটি ঘটনা আমি অনেক আগ থেকেই জানি। তা হলো, হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. যখন প্রথমবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর ইনতিকালের পর সাহারানপুরে হযরত শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. এর খেদমতে আসেন তখন তাঁর হাতে মিসর ও হিজাযের অনেক আলেমের চিঠি ছিল। সেই চিঠিগুলোতে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর 'হায়াতুস সাহাবা' গ্রন্থের অনেকগুলো ঘটনার ওপর ঐতিহাসিক নানা আপত্তি এবং সেই ঘটনাগুলোর পরিণতি ও দলিল-দস্তাবেজ সম্পর্কে বড় ধরনের আপত্তি ছিল। তাদের সব কথার সারাংশ হলো, অমুক অমুক ঘটনা হায়াতুস সাহাবা থেকে বের করে দিন। কেননা তা ইতিহাসের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়।

ওই মজলিসে তখন দু' হযরত তাদের চিঠিপত্র ও সেখানে উল্লেখিত আপত্তিগুলোর ওপর মতবিনিময় করেন। হযরত শায়খুল হাদিস রহ. তাদের সেই আপত্তিগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনার পর সেগুলো উপেক্ষা করে উত্তরে এ কথা বলেন যে,

'মৌলভি ইনআম, আপনি ওই লোকদের জবাবে শুধু এ কথা লিখে দিন যে, হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থের লেখক ইনতিকাল করেছেন। এখন সেই গ্রন্থের মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকার আমাদের নেই।'

হায়! এ ধরনের উদার আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা যদি ফাযায়েলে আমল কিতাবের সঙ্গেও দেখানো হতো। দুঃখের বিষয় হলো, যে মহলটি শুরু থেকেই দাওয়াত ও তাবলীগের চরম শত্রু; যারা চৈন্তিক ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সেই মহলটি যে কাজ মেহনতের সোনালি যুগে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.-কে দিয়ে করাতে পারেনি, তাদের ইনতিকালের পর তারা খুব সহজেই তাঁদেরই বংশীয় উত্তরাধিকারীকে দিয়ে এক ঝটকায় আদায় করিয়ে নেয়। কথাগুলো শুনতে তেতো মনে হলেও এটাই বাস্তব। কবির ভাষায়,

'হে মৃদুমন্দ সমীরণ, মৃত্যুর পর আমি আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তুলব!
আমাকে তো আমার বন্ধুরাই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।'

হায়াতুস সাহাবা সম্পর্কে হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর এই নৈতিক উত্তর থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যদি মানসিকতা ও চিন্তাধারার মাঝে সত্য মেনে নেওয়ার যোগ্যতা থাকে এবং দিল ও দেমাগ হক-বাতিলের টানাপোড়েন থেকে সুরক্ষিত হয় তাহলে নিজেদের বড়দের ইজ্জত-আব্রু হিফাযত করা খুবই আসান হয়ে যায়।

যেসকল পুরনো সাথী ও মুবাল্লিগ সাথী হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর যুগ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে নিজেদের জান, মাল ও ওয়াক্ত ব্যয় করে আসছেন, সেই বয়োবৃদ্ধ ও কর্মপৌঢ় সাথীরা প্রথম দিন থেকে এই মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের ব্যাপারে মৌখিক ও লিখিত এবং একাকী ও সম্মিলিত অর্থাৎ সর্বোতভাবে সতর্ক করে আসছেন যে, শূরা ও মেহনতের পুরনো সাথীদেরকে আশ্বস্ত না করে এই কিতাবকে বিভিন্ন ইজতিমা, আম জামাত, মসজিদ ও মারকাযে পড়া ও পড়ানো অনেক বড় ফেতনার দুয়ার খুলে দেবে। তাই তো দেখা যায়, আজ পৃথিবীর দেশে-দেশে, মারকাযে-মারকাযে, এমনকি শূরার সাথীদের পরস্পরে এই কিতাব নিয়ে যেই ঝগড়া-কলহ-বিবাদ ঘটে চলেছে, অধিকাংশ স্থানে সাথীদের পরস্পরে তুমুল বাদানুবাদের যেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আজ মেহনতের ঐক্যের প্রাচীরে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই আজ সাথীগণ একতার প্লাটফর্মে নেই। মেহনতের এই পরিণতিই তো ইসলামের শত্রুরা ও তাবলীগের বিদ্বেষী এতদিন ধরে চেয়ে আসছে, যা আজ বাস্তবায়ন হতে চলেছে।

কিছু দিন আগের একটি ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমি হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর একজন বয়োবৃদ্ধ আল্লাহওয়ালা খলিফার কাছে ফাযায়েলে আমলকে কেন্দ্র করে বিরাজমান দুর্বিসহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরার সময় অঝোর নয়নে কেঁদে ফেলি। তাকে এ তথ্য দিই যে, হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর জ্ঞানগত মর্যাদা ও মুহাদ্দিসানা শ্রেষ্ঠত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অশুভ স্বপ্ন থেকেই এই পরিকল্পনাগুলো একে একে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তখন সেই আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে, খুবই ধীরে-সুস্থে, আমার বুকের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন,

'শাহেদ! বিষয়টি নিয়ে তোমার এভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে ভেঙে পড়ার কোনো দরকারই নেই। তুমি দেখে নিয়ো, এই ফাযায়েলে আমল নিজেই প্রতিশোধ নিয়ে নেবে।'

তার সেই কথাটি আমার চোখের সামনে বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। আমি দেখেছি, মেহনতের যেসকল সাথী

জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে মুনতাখাব আহাদিসের আড়ালে ফাযায়েলে আমল কিতাবকে ছুড়ে ফেলার মিশনে নেমেছে বা যেসকল সাথী সরলমনা ও সাদাসিদা হওয়ার কারণে বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশকে দাওয়াত ও তাবলীগের রাজকীয় কীর্তি মনে করেছে, তাদের একেকজন এখন নানাধরনের বিচিত্র পরীক্ষা ও ফেতনায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ কথাগুলো লেখার সময় তাদের একেকজনের চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। অথচ এর বিপরীতে ফাযায়েলে আমলের সংকলকের নিসীম ইখলাস, উম্মাহর সংশোধনের তীব্র আবেগ, উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস পৌঁছে দেওয়ার পরম আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি লেখকের বাহ্যিক ও আন্তরিক পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, আল্লাহমুখী মনোভাবের যাদুকরি কারিশমায় ফাযায়েলে আমল কিতাব এখনো বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে, প্রতিটি জনপদে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিয়ে চলেছে। আর যারা এর মুকাবিলায় নেমেছিল, তারা নিজেরাই একে একে মুখ থুবড়ে পড়ছে।

আজ সোনালি অক্ষরে নতুন ইতিহাস রচনা হতে চলেছে যে, ফাযায়েলে আমল নিজের বদলা নিজেই নিচ্ছে। কারণ, এই কিতাব কলমের কালো কালি দিয়ে লেখা হয়নি; বরং অন্তরসেঁচা রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। এ কিতাব নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় টইটুম্বর একজন সাচ্চা মুমিনের হৃদয়ের দর্পণে অঙ্কিত ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি।

ফাযায়েলে আমল ও এর পরম সম্মানিত সংকলক সম্পর্কে অধমের উপরোল্লিখিত শতভাগ বাস্তব অনুভূতি আমার নিজের মস্তিষ্কের আবিষ্কার নয়। বরং এ কথাগুলো সংকলকের প্রিয়সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ তলহা কান্ধলভি তাঁর এক চিঠিতে তুলে ধরেছেন। যে চিঠি তিনি কয়েক বছর পূর্বে পাকিস্তানের রায়ভেন্ড মারকাযে উপস্থিত মেহনতের পুরনো সাথীদের উদ্দেশে লিখেছিলেন। সংক্ষেপে সেখান থেকে কিছু বাক্য তুলে ধরছি—

> **‘আমরা আমাদের নিজ চোখে দেখেছি এবং আল্লাহর অনেক খাস বান্দার মুখ থেকে শুনেছি যে, হযরত শায়খুল হাদিস রহ. ফাযায়েলে আমল লেখার সময় পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে যাহেরি পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। বাকি রইল আন্তরিক পবিত্রতা, সেটা তো আর দেখার জিনিস নয়।’**
>
> **তাঁর এই কিতাবগুলো পৃথিবীজুড়ে যেই বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং সাধারণ মুসলমানের জীবনে যেই অবিস্মরণীয় প্রভাব রেখে চলেছে, এথেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, এ ধরনের মকবুলিয়ত ও উপকারিতা শতভাগ ইখলাস ছাড়া সম্ভব নয়।’**
>
> **‘হযরত শায়খুল হাদিস রহ. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. ও মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. প্রমুখ হযরতগণ মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের ব্যাপারে জানতেন। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. তাঁর শেষ জীবনে যেই পলিসির ব্যাপারে বলেছিলেন যে, ‘পলিসি চূড়ান্ত হয়ে গেছে’ যদি সেই পলিসির মাঝে এই কিতাবটিও ইজতিমায়িভাবে তালীমের সিদ্ধান্তে থাকতো তাহলে সেই হযরতদের জীবদ্দশাতেই এর তালীম শুরু হয়ে যেতো।**
>
> **কাজেই অধমের নিবেদন হলো, কারো কোনো আপত্তির পরোয়া না করে এই নিসাবি কিতাবকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বহাল রাখা হোক। যদি এক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখানো হয় তাহলে তা তাবলীগের মেহনতের জন্যে ক্ষতিকর হবে। এমনকি কারো ব্যাপারে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা শোনা গেলে তৎক্ষণাৎ তা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। ইনশাআল্লাহ, এতেই আমাদের সবার কল্যাণ। অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের এ নির্দেশই করে।’**

ফাযায়েলে আমল ও মুনতাখাব আহাদিস কিতাবদুটির ব্যাপারে এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে কথাগুলো লিখেছি, সেগুলোর সম্পর্ক হিন্দুস্তানের সঙ্গে। পাকিস্তানের পরিবেশ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা আমাদের বিপরীত রুখে চলছে। সেখানকার যিম্মাদার ও প্রভাবশালী মহল এবং মারকাযের সদস্যগণ, বিশেষত রায়ভেন্ড মারকাযের শূরার সাথীগণ তাঁদের দূরদর্শী ও গভীর প্রজ্ঞা, সর্বোপরি দাওয়াত ও তাবলীগের সকল উসূল ও হিদায়াতের ওপর অনঢ় অবস্থানের কারণে মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের মুদ্রণ ও প্রকাশনার নেপথ্যের গতিবিধি প্রথম দিনেই ধরে ফেলতে পেরেছিলেন। তারা তখন থেকে এই উদ্যোগের পরণতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যার কারণে সেখান থেকে কাছের ও দূরের, দেশ-বিদেশের সকল জামাতকে এখন পর্যন্ত স্রেফ ফাযায়েলে আমল পড়া ও পড়ানোর ওপরই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

সেখানকার শূরার সাথীগণ ও যিম্মাদারগণ কিতাবটি কেন্দ্র করে সবসময় তাদের গভীর দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করে এসেছেন। তারা বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে অন্যদের মনোযোগও আকর্ষণ করেছেন। তাইতো দেখা যায়, ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত টঙ্গি ইজতিমাতেও সেখানকার সাথীদের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে তাদের দুশ্চিন্তা ও গভীর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করে আট পয়েন্টের একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেই চিঠির ষষ্ঠ নম্বর পয়েন্টে এই কিতাব সম্পর্কে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে আমার সর্বপ্রথম পাকিস্তান সফরটি হয়েছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ ঈ. সালের রায়ভেন্ড ইজতিমার সময়। আল্লাহ তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া যে, এই দীর্ঘ সময়ে (গুটিকয়েক ইজতিমা ব্যতিরেকে) সবগুলো ইজতিমায় অশংগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। প্রথম দিকে হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর পৃষ্ঠপোষকতায়, দ্বিতীয় যুগে হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এবং তৃতীয় যুগে হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর ভালোবাসা ও স্নেহের প্রাবল্যের জোড়ে অধম শরিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার জন্মগত অভিরুচির কল্যাণে (বা আরেকটু শুদ্ধ ভাষায় হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর মুবারক অভ্যাসের সংস্পর্শে) প্রতিটি ইজতিমার চাক্ষুষ পরিদর্শন, সবধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিস্থিতি ও চিন্তাধারা অধ্যয়ন, মেহনতের কীর্তিমান মনীষাদের সঙ্গে বারংবার সাক্ষাত, জামাতে গমনকারী দেশি-বিদেশে সাথীদের হিসেব এবং সেই হিসেবের মাঝে প্রতিবছর সংখ্যাওয়ারি বৃদ্ধির বিস্ময়কর উন্নতি, দেশীয় জটিলতা ও আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং তাবলীগের আকাবির হযরতদের পক্ষ থেকে সেগুলোর নিরসন, এর পাশাপাশি সংবাদজগতের ভেতরের-বাইরের বিভিন্ন রিপোর্ট ও প্রবন্ধ পড়ে সেগুলোর নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং এরপর পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে আমার দিনলিপির ডায়েরিতে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ টুকে রাখার আমার এই প্রয়াস থেকে সম্ভবত কোনো বছর বা কোনো ইজতিমা বাদ যায়নি।

আল্লাহ মাফ করুন। অনেকেই আমার এ কথাগুলো আত্মপ্রশংসা বা আত্মশ্লাঘা মনে করতে পারেন। কিন্তু এরপরও আমি এখানে একটি তথ্য পেশ করতে বিন্দুপরিমাণ দ্বিধা করব না। আমার এই কথার সঙ্গে কেউ অমত হলে তাকে আমি কোনো ধরনের জোরাজুরি করতেও যাব না। তা হলো, বর্তমান সময়ে পুরো পৃথিবীতে দাওয়াত ও তাবলীগের যেই মেহনত চলছে, সেই পুরো মেহনতের শতকরা আশি ভাগ অংশ সর্বজন শ্রদ্ধেয় হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের দিকনির্দেশনায় রায়ভেন্ড মারকাযের পুরনো সাথী ও শূরার সদস্যগণের মাশওয়ারা ও নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। তাদের এই সফল নেতৃত্ব ও মজবুত বুনিয়াদের একমাত্র কারণ হলো, সেখানে ওই হযরতগণ দাওয়াত ও তাবলীগের চার মহান আকাবির অর্থাৎ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উসূল ও দিকনির্দেশনার ওপর পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে অবিচল থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নের হাদিসগুলো শতভাগ মেনে চলছেন–

১. তিনি ইরশাদ করেছেন, اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ – বড়দের সঙ্গে থাকার মাঝেই বরকত।

২. তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

> **'তোমাদের কেউ যদি আদর্শ খোঁজে তাহলে সে যেন মৃত লোকদের মাঝে আদর্শ খোঁজে। কেননা জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা বিদ্যমান।'**

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে তৃতীয় হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. এর একটি মালফুজাতের কথা কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আমার মস্তিষ্কে চলে এসেছে। যে কথাটি তিনি বারবার বলতেন,

> **'আমি কখনই নিজেকে রায়ভেন্ডওয়ালাদের আমির মনে করিনি; বরং তাদেরকে সবসময় নিজের সঙ্গী ও দাওয়াতি সাথী মনে করি।'**

এখন সেই শতকরা আশি ভাগ সফল নেতৃত্বের মাঝে তৃতীয় হযরতজির সেই দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি, পৃষ্ঠপোষকতা ও উদার আন্তরিকতার কতটুকু প্রভাব বিদ্যমান, তা স্রেফ ওই ব্যক্তিই বুঝতে পারবে, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ থেকে দাঈসুলভ বৈশিষ্ট্য ও মুমিনসুলভ দূরদৃষ্টি দান করেছেন। আর যাকে আল্লাহ চোখ দেননি, সে দিনে-দুপুরে কোত্থেকে সূর্য্যের প্রখর আলো দেখবে!

মসজিদসংলগ্ন হুজরা ও অঙ্গীকার লংঘন

দিল্লি তাবলীগি মারকাযে মসজিদ ঘেষে নির্মিত একটি কামরা দাওয়াত ও তাবলীগের ইতিহাসের চাক্ষুষ সাক্ষীর ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কামরায় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. নিজ নিজ ইমারতের জামানায় অবস্থান করতেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে নিজ ইনতিকাল (রজব ১৩৬৩ হি./জুলাই ১৯৪২ ঈ. পর্যন্ত) আঠারো বছর মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. প্রথম হযরতজি হিসেবে, তাঁর ইনতিকালের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. নিজ ইনতিকাল (যিলকদ ১৩৮৪ হি./ এপ্রিল ১৯৬৫ ঈ.) পর্যন্ত বাইশ বছর দ্বিতীয় হযরতজি হিসেবে, তাঁর ইনতিকালের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. তাঁর ইনতিকাল (মুহাররম ১৪১৬ হি./ জুন ১৯৯৫ ঈ.) পর্যন্ত বত্রিশ বছর তৃতীয় হযরতজি হিসেবে সেই কামরায় অবস্থান করেছেন।

ওই কামরার ছাদ যেহেতু অনেক উঁচুতে অবস্থিত ছিল, এজন্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর যুগে সেখানে সামনের দিকে কাঠের তকতা দিয়ে একটি ছাদ বানিয়ে সেই রুমটাকে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর 'দারুত তাসনিফ'—বা 'লেখালেখির রুম' নামকরণ করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. এর যুগে তার পেছনের অংশে পাকা ছাদ বানিয়ে সেটিকে একটি কামরার আকৃতি দেওয়া হয়।

জনাব আলহাজ ভাই মুহাম্মদ ইউসুফ রঙ্গওয়ালে (করাচি) তৃতীয় হযরতজি রহ. এর আরাম ও বিশ্রামের প্রয়োজনে এ কামরাটি বানিয়ে দিয়েছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. এর ইনতিকাল পর্যন্ত এই কামরা প্রতিদিন সকালে মাশওয়ারার জন্যে খোলা হতো। কিন্তু জানি না, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মনের ভেতর পুষে রাখা বিদ্বেষের কারণে, না-কি অন্যকোনো ব্যক্তির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার প্রাবল্যের কারণে, অথবা তৃতীয় কোনো অজ্ঞাত কারণে অন্য সব দাবি-দাওয়ার মতো এ দাবিটিও সাহেবযাদা সাল্লামাহুর পক্ষ থেকে প্রচণ্ড জোরালোভাবে তোলা হয় যে, এ কামরাটি আমার প্রয়োজন। কাজেই তা আমার হাতে তুলে দেওয়া হোক। এই দাবির পক্ষের আওয়াজ দিনদিন গরম হতে থাকে। এই উষ্ণতার তাপে মারকাযের ভেতরের পরিবেশ ক্রমশ গুমোট হতে শুরু করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তখন তার একান্ত আস্থাভাজন সাথী, যারা বর্তমান সময়ে তার সবচেয়ে অনাস্থাভাজনে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ ভাই ফারুক আহমদ ব্যাঙ্গলোর, জনাব ডক্টর সানাউল্লাহ আলিগড়, জনাব আবদুল হাফিয মুনয়ার সুরাট, জনাব ভাই মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি আলিগড় প্রমুখকে এ সমস্যার সমাধানের জন্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পেশ করেন।

এ সকল হযরত অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করার পদক্ষেপ হিসেবে ১০ সফর ১৪১৭ হি. / ২৭ জুন ১৯৯৬ ঈ. বৃহস্পতিবার নিজেরা একসঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে বসে এ জাতীয় জটিলতাগুলো নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন।

আমার দিনলিপির ডায়েরিতে টুকে রাখা তথ্যানুসারে এই পারস্পরিক পরামর্শসভাটি অনুষ্ঠিত হয় সাহেবযাদার এক নম্বর হুজরায়। সেখানে মারকাযের বিভিন্ন সমস্যা যেমন, হযরতজির কামরা এবং মাওলানা যুবায়র সাহেবের সকাল ১১টার দুআ ইত্যকার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর ডাল-পালা ছড়াতে ছড়াতে এ সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয় নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে।

সে মজলিসে সিদ্ধান্ত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত হুজরাটি সম্পর্কে এ অনুসন্ধান সম্পন্ন না হয় যে, এটি কি উত্তরাধিকার সম্পত্তি না মসজিদের অংশ, ততদিন পর্যন্ত এ হুজরার তালার তিনটি চাবি বানিয়ে মাওলানা ইযহারুল হাসান, মাওলানা যুবায়রুল হাসান ও মৌলভি সাদ সাহেবকে একটি করে চাবি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সকালের মাশওয়ারা সেখানে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আরো সিদ্ধান্ত হয়, উপরের জলছাদের দু' রুমে যার যেই কিতাব আছে তা যেন নিয়ে নেয়।

আমি সাহারানপুরে থাকাবস্থায় বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটার দিকে এই মাশওয়ারার সংবাদ শুনতে পাই। তখন মাওলানা যুবায়র সাহেবের কাছ থেকে সংবাদ আসে, তুমি দিল্লি চলে এসো। পরদিন শুক্রবার সকালে বাসে চড়ে রওয়ানা হই। জুমুআর নামায শাহদারায় আদায় করে তিনটার দিকে দিল্লি মারকাযে পৌঁছি। সেদিন অর্থাৎ ১১ সফর শুক্রবার হুজরাটি খোলা হয় এবং প্রথমবারের মত সেখানে মাশওয়ারা অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘটনার ঠিক ৪৫ দিন পর সেই হুজরাতেই মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব ইনতিকাল করেন।

১৭ সফর ১৪১৭ হি. / ৪ জুলাই ১৯৯৬ ঈ. তারিখে মজলিসে শূরার পাঁচ হযরত মারকাযের ভেতরের ও বাইরের উৎস

থেকে তৈরিকৃত উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে পারস্পরিক শলা-পরামর্শ ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রচণ্ড বিবাদমুখর এই জটিলতাগুলো নিরসন করার জন্যে যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে পাঠিয়ে দেন।

আমার দিনলিপির ডায়রি থেকে সেই তথ্য তুলে ধরছি।

'আজ ১৭ সফর ১৪১৭ হি. / ৪ জুলাই ১৯৯৬ ঈ. শুক্রবার শূরার পাঁচ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইযহারুল হাসান সাহেব রহ. মাওলানা উমর সাহেব রহ. মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব রহ. মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. ও মৌলভি সাদ সাহেব নিম্নের বিষয়গুলো মাশওয়ারার মাধ্যমে চূড়ান্ত করেন—

১. মসজিদের ইমামত এবং মাগরিব পরবর্তী দুআ মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব আঞ্জাম দেবেন। জামাতের রওয়ানাকালীন দুআ ও মুসাফাহা মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান রহ. আঞ্জাম দেবেন।

২. মসজিদ সংলগ্ন হুজরা, যেখানে বড় হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. অবস্থান করতেন, সেই হুজরার ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো যে, খুব দ্রুত এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে বের করা হবে যে, হুজরাটি মূলত কার? এটি কি মসজিদের অংশ, না অন্দরমহলের অংশ?

   ফিলহাল এই হুজরার ব্যাবহার প্রসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো যে, শূরার পাঁচ হযরত প্রতিদিন সকাল ৯ ঘটিকার মাশওয়ারা এখানে আয়োজন করবেন। মাশওয়ারার পর এই কামরা তালাবদ্ধ করে দেওয়া হবে। হুজরার একটি করে চাবি মাওলানা ইযহারুল হাসান রহ. মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান রহ. ও মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেবের কাছে থাকবে।

৩. এই হুজরার দুটি জলছাদের কামরায় হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর যেই কিতাবগুলো আছে তা মৌলভি সাদ সাহেব নিয়ে যেতে পারবেন। তদ্রূপ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর যেসব কিতাব ও আলমারি আছে এবং বাইরে যে সামান আছে, তা মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. নিয়ে যেতে পারবেন। মাদরাসায়ে কাশিফুল উলূমের যেসব কিতাব আছে, তা ভেতরে থাকবে।

৪. ঘরের মহিলাগণ শুক্রবার তাসবিহের নামায ও জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণ করার জন্যে এই হুজরায় আসতে পারেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

৫. এই লিখিত সিদ্ধান্ত আজ ১৯ সফর ১৪১৭ হি. রোববার শূরার হযরতদেরকে শোনানো হলো। তাদের নির্দেশে স্মারক হিসেবে লিখে রাখা হলো।

৬. এই মাশওয়ারার মাঝে আবদুল হাফিয মুনিয়ার, ফারুক আহমদ, ডক্টর সানাউল্লাহ, মুহাম্মদ উসমান আলি খান ও মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো যে, এ হযরতগণ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করে শূরা হযরতদের সামনে পেশ করবেন।

লিখেছেন, মুহাম্মদ উসমান আলি খান।

ওই মাশওয়ারার মাঝে উপরিউক্ত পাঁচ হযরত বিষয়টির নাজুকতা ও সম্ভাব্য জটিলতা সামনে রেখে বাসভবন, মসজিদ ও হুজরা সম্পর্কিত ভূমি ও মালিকানার বাস্তবতা যাঁচাই করার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেন। তারা একাধিকবার দিল্লির ওয়াকফ বোর্ড অফিসে গিয়ে প্রাচীন কাগজপত্র ও ফাইল ঘাটাঘাটি করেন। যত নতুন ও পুরনো বিক্রিপত্র রয়েছে, সেগুলো পড়েন। অন্দরমহলের একটি নকশা তৈরি করা হয়। এ কাজে জনাব ফসিহুদ্দিন, কাযি হুসাইন আহমদ দেহলভি ও জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফির কাছে বারবার দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে চার পাতার একটি রিপোর্ট ৮ রবিউল আউয়াল ১৪১৭ হি. / ২৫ জুলাই ১৯৯৬ ঈ. তারিখে তৈরি করে শূরার সদস্যদের খেদমতে পেশ করা হয়।

দুঃখের বিষয় হলো, ১৭ সফর ১৪১৭ হি. / ৪ জুলাই ১৯৯৬ ঈ. তারিখে মজলিসে শূরার পাঁচ হযরতের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত লিখিত চুক্তিনামার কালি এখনো শুকায়নি এবং সর্বসম্মত অঙ্গীকারকে লিখিত আকার প্রদানের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এখনো প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেননি, তার আগেই অঙ্গীকার লঙ্ঘনের নতুন নতুন চিত্র সামনে আসতে শুরু করে।

* সিদ্ধান্তের কিছু দিন পরেই এখানে মহিলাদের তারাবিহের নামায আদায় করার ওপর নিষেধাজ্ঞা চলে আসে। অথচ এই

জামাত আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. এর যুগ থেকে নিয়মিত চলে আসছে।

* সেই রমাযানের শেষ দশকে যখন মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. ইতিকাফের জন্যে মসজিদে বসে যান তখন এই হুকুম জারি করা হয় যে, এই হুজরা অতিক্রম করে মাওলানার অন্দরমহল থেকে আসা-যাওয়া ও সেখান থেকে সাহরি-ইফতারি আনা-নেওয়া করা নিষিদ্ধ।

যার ফলে মৌলভি যুহায়র, সুহাইব, খুবাইব প্রমুখগণ শেষ দশকে ঘর থেকে মসজিদ এবং এরপর মসজিদের চত্বর দিয়ে হেঁটে ইতিকাফরত মাওলানার জন্যে যাবতীয় খাবার-দাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন এবং এভাবেই ফিরে যেতেন।

* এরপর হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর সকল জিনিসপত্র ও কিতাবাদি নিজের লোকদেরকে দিয়ে হুজরার জলছাদের দু'টি হুজরা থেকে বের করে মাওলানা যুবায়র সাহেব রহ. এর কামরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শাহি দরবারের চাকর-ভৃত্যগণ যখন কোনো ধরনের পূর্ব অবগতি ছাড়াই এভাবে কিতাবাদি ও সামানপত্র নিয়ে হঠাৎ মাওলানা রহ. এর কামরায় পৌঁছে তখন তিনি ভীষণ অবাক হন। তিনি তখন প্রচণ্ড আঘাত পান; কিন্তু যথারীতি তাঁর পূর্ব অভ্যাস অনুসারে এবারও তিনি মৌনতা অবলম্বন করেন।

* বাইরের ও ভেতরের কিছু উৎস থেকে প্রশ্রয় পেয়ে ওই সময় সাহেবযাদার মস্তিষ্কে বলপ্রয়োগের নেশা এতোটাই চড়ে বসেছিল যে, তিনি এ ঘটনার কিছু দিন পর খাবারের দস্তরখানে, উপস্থিত অন্যান্য লোকের সম্মুখে মাওলানা রহ.-কে শাসকের ভাষায় নির্দেশ দেন যে, আমি হুজরার ভেতর ইসতিনজাখানা তৈরি করব। কাজেই আলমারি বের করুন।

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. যখন সেই নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা অবকাশ চান তখন সাহেবযাদা খাবারের সেই দস্তরখানেই ক্রোধ প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তালার চাবি চেয়ে বসেন। এরপরের ঘটনা খোদ মাওলানা যুবায়র সাহেবের মুখ থেকে শুনুন। তিনি বলেন, 'আমি পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মারকাযের অবমাননার দিকে তাকিয়ে খাবারের পরপরই সেই চাবি তার কাছে পাঠিয়ে দিই।'

অথচ লিখিত অঙ্গীকারের ধারা অনুসারে এই তালার তিনটি চাবি তিন হযরতের কাছে থাকার কথা; কিন্তু এখন সম্মিলিত সিদ্ধান্তের কয়েক দিনের মাথায় সেই তালাই বদলে গেল।

সাহেবযাদা সাহেব যখন কোনো ব্যক্তিগত সফরে যেতেন তখন সকালের মাশওয়ারায় সেই হুজরায় করতেন না; বরং বাইরের হলে করতেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা যুবায়র সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব, মাওলানা আহমদ লাট সাহেব ও প্রফেসর মুহসিন সাহেব প্রমুখকে সেই হলে ডাকতেন এবং সেখানেই মাশওয়ারা সম্পন্ন করতেন।

একটি শাখা মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠা ও সেই মজলিসের পরিণতি

তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এই বিশ্ববিস্তৃত দাওয়াতি মেহনতের হিফাযত ও মেহনতকে নিজ পুরনো মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে একটি আলমি শূরা গঠন করেছিলেন। তার এই পদক্ষেপের উপকারিতা ও সামগ্রিক কল্যাণের প্রমাণ পেয়ে সারা বিশ্বের সবগুলো দেশের মেহনতের সাথীগণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। মেহনতের বাইরের লোকেরাও এ পদক্ষেপকে একটি বাস্তব-সমর্থিত উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একটা কথা লোকমুখে প্রচলিত আছে, 'বাতির নিচে অন্ধকার'। এখানেও সেই প্রবাদপ্রবচনের প্রয়োগ ঘটেছে। হযরতের সেই পদক্ষেপের উপকারিতা তাঁর পরিবারে কিছু কাছের লোক বুঝতে পারেনি। তারা যেহেতু তাঁর এই উদ্যোগকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি, এজন্যে তারা এর উপকারিতা ও বাস্তববাদিতার কথা কখনই মুখ ফুটে স্বীকার করেনি। তারা কীভাবেই বা এ পদক্ষেপ মেনে নেবে! তারা তো একে হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর বত্রিশ বছরের নেতৃত্বামলের একটি স্খলন মনে করে। তারা তো এ পদক্ষেপকে তাদের ভবিষ্যতের জন্যে কাঁটা মনে করে।

হযরতের ইনতিকালের পর প্রায় আট বছর এ আশায় কেটে যায় যে, হয়তো আলমি শূরাকে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে; কিন্তু সেই আশা যখন নিরাশায় পর্যবসিত হয় তখন যিলহজ্ব ১৪২৪ হি. মুতাবেক ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ঈসাব্দে দাওয়াত ও তাবলীগের বারোজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মনে এই তাকাযা সৃষ্টি হয় যে, এখন যেহেতু আলমি শূরাকে যথোচিতভাবে

কাজ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, কাজেই এখন কমপক্ষে একটি *স্থানীয় মজলিসে শূরা* গঠন করে সবার সম্মতি নিয়ে সেই মজলিসের সদস্য নির্বাচন করা হোক। এই মজলিসের মাধ্যমে পরস্পরের বিতর্কিত বিষয়গুলোতে সবার অথবা নিদেনপক্ষে অধিকাংশ সদস্যের অভিমতের ভিত্তিতে সমাধান বের করা যাবে। সেই তাকাযা অনুসারে, নিযামুদ্দিন মারকাযের জন্যে একটি স্থানীয় মজলিসে শূরা গঠন করা হয়। দশজন শীর্ষস্থানীয় সাথী সমেত এই মজলিসে শূরার মাঝে আরো যারা ছিলেন, তাদের নাম যথাক্রমে,

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব দিল্লি
২. জনাব আলহাজ্ব রহমতুল্লাহ (বানারস)
৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম দেওলা (গুজরাট)
৪. মাওলানা আহমদ লাট (গুজরাট)
৫. মাওলানা ইসমাঈল গোধরা (গুজরাট)
৬. জনাব ভাই ফারুক আহমদ (ব্যাঙ্গলোর)
৭. জনাব আলহাজ্ব খালেদ সিদ্দিকি (আলিগড়)
৮. জনাব আলহাজ্ব সানাউল্লাহ (আলিগড়)
৯. জনাব প্রফেসর আবদুল আলি (আলিগড়)
১০. জনাব প্রফেসর মুহাম্মদ মুহসিন (লাখনৌ)
১১. জনাব আলহাজ্ব সালমান বেগ (আলিগড়)
১২. জনাব প্রফেসর মাসউদ আবদুল হাই (নাগপুর)

২২ যিলহজ্ব ১৪২৪ হি. / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ঈ. তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে এ সকল সাথীকে নির্বাচিত করে এই মজলিসের কার্যক্রমের ক্ষেত্র ও পরিধির জন্যে পাঁচ দফা বিশিষ্ট যেই দস্তাবেজ সবার সম্মতিতে চূড়ান্ত হয়, তার পূর্ণ খসড়া আপনাদের সামনে তুলে ধরছি–

১. এই মজলিসে শূরা মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. ও মাওলানা সাদ সাহেব কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য দিয়ে গঠিত। তারা দুজনই নিজ থেকে এর সদস্য প্রস্তাব করেছেন। কাজেই কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে সেই শূন্যস্থান পূরণের অধিকার তাদের হাতে থাকবে।

২. এই মজলিসে শূরা দাওয়াত ও তাবলীগের ওই সকল 'উমূর' (বিষয়) ও মারকায পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ওই সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করবে, যেগুলোর ওপর এ দু' হযরত কোনো কারণে একমত হবেন না। এ জাতীয় বিষয়গুলো সম্মিলিত পরামর্শে নিষ্পন্ন হবে।

৩. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যেই বিষয়গুলো তাদের পরস্পরে নিষ্পন্ন না হবে, যেমন বাসভবন ইত্যাদি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও এই মজলিসে শূরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবে।

৪. যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে সবার সম্মতিতে বা অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিতে।

৫. দাওয়াত ও তাবলীগের যে বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পরে মতভিন্নতা বিরাজ করছে, সেগুলো নিয়ে এ মজলিসে আলোচনা ও মতবিনিময় হবে। এই মজলিস তখন নিজেদের সিদ্ধান্ত এ দু' হযরতকে অবহিত করবে। মজলিসের এ ফয়সালা যদি তাদের কেউ কবুল না করেন তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে, যতক্ষণ না এ দু' হযরত এর ওপর একমত হন।

স্থানীয় মজলিসে শূরা গঠিত হওয়ার পর প্রথম পাঁচ মাসে এই হযরতগণ বেশ বিষণ্ন মনে চারটি বৈঠক আয়োজন করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও কথাবার্তা বলেন।

এই মজলিসে শূরার প্রথম বৈঠক ৩০ রজব ১৪২৫ হি. / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ঈ. বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এই মজলিসে শূরা গঠনের ওপর তাঁর আন্তরিক প্রশান্তি ও প্রস্বস্তি এবং বড়দের পদচিহ্ন অনুসারে মেহনত অব্যাহত রাখার ওপর নিজের অন্তরের আবেগদীপ্ত অনুভূতি যেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করে তিন-তিনটি চিঠি লিখে শূরার সদস্যদের সামনে পেশ করেন, তা নিঃসন্দেহে দাওয়াত ও তাবলীগের আশি

বছরের ইতিহাসের একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। তাঁর লেখা সেই চিঠিগুলো বর্তমান অন্ধকার সময়ে আমাদের জন্যে আলোর বাতিঘর। আমি পাঠকবর্গের সামনে সেই চিঠিগুলো হুবহু তুলে ধরছি—

প্রথম চিঠি

সম্মানিত হযরতগণ,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণায় দাওয়াতের মেহনত সম্পর্কিত বিষয়াদি ও সমস্যাসমূহের সমাধান করার জন্যে একটি কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছে। মহান আল্লাহ এই মজলিসকে আমাদের সবার জন্যে, মারকাযের জন্যে কল্যাণকর বানিয়ে দিন। এই মজলিসকে কল্যাণের সকল ফটক খোলার এবং অকল্যাণের সকল ফটক বন্ধ হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

এই দ্বিতীয় বৈঠকে আলোচনার জন্যে বান্দার ভাবনায় কিছু বিষয় এসেছে। আশা করি, সেগুলোর ওপর আপনারা চিন্তা-ভাবনা করবেন,

১. মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব নিজের পক্ষ থেকে সদস্যদের যেই তালিকা আপনাদেরকে দিয়েছিলেন, সেখানে মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের নামও ছিল। কিন্তু শূরার প্রথম বৈঠকে তৎক্ষণাৎ আমাকে অবহিত করা হয় যে, এখন তার নাম নেই।

আমি এ সংবাদ পেয়ে খুবই বিস্মিত হয়েছি। মৌলভি আহমদ লাট সাহেব মেহনতের পুরনো সাথীদের একজন। দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে তিনি মারকাযে মুকিম। দূরদর্শী ব্যক্তি। সম্মানিত আব্বাজান রহ. তাঁর বয়ান শুনে শুধু প্রশান্তই হতেন না; বরং তিনি তাঁর বয়ানকে প্রভাব বিস্তারকারী মনে করতেন।

কাজেই বান্দার অভিমত হলো, আপনারা তাকে আপনাদের এই মজলিসে শূরায় অবশ্যই নিয়ে নেবেন। ইনশাআল্লাহ আন্তর্জাতিক স্তরেও উপকৃত হবেন।

২. আমি আমার বিগত অনুরোধপত্রে লিখেছিলাম, আমাদের মাঝে আমাদের বড়দের মত আবেগ নেই, ত্যাগ নেই, ইখলাসও নেই। কাজেই আমাদেরকে এ চেষ্টা করতে হবে যে, দাওয়াতসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো থেকে শুরু করে মারকাযসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোতেও আমরা যেন তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলি। ইনশাআল্লাহ, এরূপ হলে সকল ফিতনা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যাবে এবং অন্যদের সমালোচনা ও নিন্দা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

এতটুকুই নিবেদন।

পঞ্চম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ২৭, ২৮, ২৯ নভেম্বর ২০০৪ ঈ. / ১৩, ১৪, ১৫ শাওয়াল ১৪২৫ হি. তারিখে। সেই বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শূরার সদস্যগণ প্রয়োজন বোধ করেন যে, বাইরের হুজরা ও পারিবারিক বিষয়াদি (বিশেষত বাসভবনের বাটোয়ারা) ইত্যাদি সম্পর্কে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনা জানা দরকার। সেমতে বৈঠকের কমপক্ষে দু' মাস পূর্বে ৬ অক্টোবর ২০০৪ ঈ. (২০ শাবান ১৪২৫ হি.) তারিখে শূরার সদস্যদের পক্ষ থেকে মরহুম আলহাজ সালমান বেগ মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ.-কে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি, অন্য ভাষায় বললে তাঁর সমস্যা ও জটিলতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা রহ. সেই শাখা মজলিসে শূরাকে নিম্নের চিঠি লিখে পাঠান—

দ্বিতীয় চিঠি

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের মজলিসে শূরার বিগত বৈঠকে অন্দরমহল সম্পর্কে যেই বিষয়গুলো আলোচিত হয়, সেগুলো সম্পর্কে জনাব সালমান বেগ ভাইয়ের ৬ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে লেখা একটি চিঠি প্রিয় মৌলভি সাদ সাহেবের লেখা সহকারে আমি হাতে হাতে পেয়েছি। আমি বিগত চিঠিতে

মেহনত ও এর মানহাজের হিফাযত সম্পর্কে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম, যা অবশ্যই দেখে থাকবেন।

আমার ঘুণাক্ষরেও এ কল্পনা করিনি যে, ইজতিমায়ি মেহনতের মুকাবিলায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিগত কাজ বেশি গুরুত্ব পাবে। কেননা এই মজলিসে শূরা শুধু এ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়নি যে, আমার অথবা মৌলভি সাদ সাহেবের বাড়ির সমস্যার সমাধান করবে, আর এরপর সেই মজলিস বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে; বরং এই মজলিসে শূরার আসল কাজ হলো, সেই সব অনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, যেগুলোর কারণে দাওয়াতের এই আলমি মেহনত বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীতে আমাদের (নিযামুদ্দিন) মারকাযের অবমাননা করছে। যা মেহনতকে দুটি ভিন্ন গতিপথে ফেলে দিচ্ছে। দুটি ভিন্ন গতিপথ বা রুখের একটি হচ্ছে, যার ওপর আমাদের পুরনো আকাবির হযরত রেখে গেছেন। আর দ্বিতীয় গতিপথ হচ্ছে, যার ওপর আমাদের নতুন বড়রা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

ফিলহাল আমার অভিমত হলো, আপনারা বিগত অনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোর প্রতিবিধান করে আগামীর পদক্ষেপ নিন। যেমন, বাইরের হুজরার সমস্যা। প্রায় দশ-বারো জন সদস্য (মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব, মৌলভি সাদ সাহেব ও আমি যুবায়রুল হাসান প্রমুখ) এর স্বাক্ষর সহকারে একটি লিখিত সিদ্ধান্ত সংকলিত হয়ে এই হুজরা সম্পর্কে যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এখন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কর্মকাণ্ড চলছে। কিন্তু স্বাক্ষরকারী হযরতগণ —যাদের কেউ কেউ এ সময় শূরার মাঝেও উপস্থিত রয়েছেন— তারা এই অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অসদাচরণ প্রতিহত করছেন না। এমনকি আমাকে খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের মৌখিক ও আক্রমণাত্মক নোটিশ পাঠিয়ে ওই কামরায় থাকা আমার যাবতীয় সামানপত্র বের করতে হয়েছে। জলছাদের রুমদুটি থেকে সম্মানিত আব্বাজানের সকল সামানপত্র ও কিতাবাদি গ্রহণ করতে হয়েছে। কারণ, মৌলভি সাদ সাহেব উপর থেকে সকল সামান ও কিতাবাদি তাঁর দু-তিনজন খাদেমের মাধ্যমে উঠিয়ে নিচের হুজরায় এনে ফেলেছেন এবং আমাকে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, আমি যেন আমার সামান নিয়ে আসি।

এই জোরজবরদস্তিমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি তাৎক্ষণিক কিছু বলা সঙ্গত মনে করিনি। বিধায়, নীরবে সব উঠিয়ে নিয়ে আসি।

এ ঘটনার কিছু দিন পর তিনি দুপুরের খাবারের মজলিসে আমাকে নির্দেশ করলেন, হুজরার ভেতর ইসতিনযাখানা বানাতে হবে। কাজেই সেখানে (সম্মানিত আব্বাজানের) যেই আলমারি রাখা আছে, সেগুলো বের করে নিয়ে যান। আমি খানিকটা দ্বিধা দেখালে তিনি দস্তরখানের ওপরই ক্রোধ প্রকাশ করেন। তিনি তখন বলেছিলেন, '(আলমারিগুলোর) সবগুলো চাবি এখনই নিয়ে আসুন। এই কাজ এখনই সম্পন্ন করতে হবে।'

আমি বর্তমান পরিস্থিতি, সামগ্রিক কল্যাণ ও মারকাযের অবমাননার দিকে তাকিয়ে খাবারের পরপরই সবগুলো তালা-চাবি পাঠিয়ে দিই।

আমি শূরার সকল সাথীকে অবহিত করতে চাচ্ছি যে, উপরের জলছাদের রুমে দুটি অংশ রয়েছে। পেছন দিকে পাকা অংশ (কামরা) সম্মানিত আব্বাজানের অসুস্থতা ও নির্বিঘ্ন বিশ্রামের প্রয়োজনে ভাই ইউসুফ রংওয়ালা বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন বাদশাহ নামদারের নির্দেশের নিচে সেটিরও বলি হতে চলেছে।

আমি একটু পর পর এ কথা অনুভব করি এবং সেই অনুভবের কারণে কষ্ট বোধ করি যে, যদি হুজরার ক্ষেত্রে লিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হত তাহলে আমি অধম মসজিদের জামাত থেকে মাহরুম হতাম না। এখন আমাকে বিগত দশ বছর ধরে মসজিদের বাইরে নামায আদায় করতে হচ্ছে। শারীরিক সমস্যার কারণে প্রতি নামাযে মূল ভবনে যেতে এবং একে-ওকে ডিঙিয়ে রাস্তা বানাতে সংকোচ অনুভব করি। কাজেই অধমের নিবেদন হলো, যেই সমস্যাগুলোর ওপর সবার সম্মতিতে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পরও লঙ্ঘন হচ্ছে, সেগুলোর সমাধান করা হোক।

এতটুকুই নিবেদন।

উপর্যুক্ত লেখার পাশাপাশি শূরার সদস্যদের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে মাওলানা রহ. মারকাযের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও দাওয়াতি মেহনত সম্পর্কে তাঁর কিছু আশঙ্কার কথা তিনি চিহ্নিত করে তৃতীয় আরেকটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন।

শূরার পঞ্চম বৈঠকটি ছিল শেষ বৈঠক। সেখানে প্রচণ্ড উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওই বৈঠকে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর লেখা একটি চিঠি পড়া হয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অনেকগুলো ঘটনা ও তথ্যে টইটুম্বর সেই

তৃতীয় চিঠি তাঁর আজীবন মাজলুম হয়ে জুলুম সয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক দস্তাবেজ। সেই চিঠি এ কথার প্রমাণও বহন করে যে, তিনি সবসময় সমালোচকদের নিন্দাবাক্য উপেক্ষা করে সত্য কথা বলে গেছেন। একজন মহান পিতার সুযোগ্য সন্তান হিসেবে তাঁকে নির্দ্বিধায় এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়েছে।[৮]

তৃতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

হযরত হাজি রহমতুল্লাহ সাহেবের একটি চিঠি পেয়েছি। ওই চিঠিতে আমাকে এই মজলিসে শূরার মাঝে উপস্থাপনযোগ্য কিছু সমস্যা ও সংশোধনযোগ্য কিছু বিষয়ের তালিকা উপস্থাপন করার অনুরোধ করা হয়েছে।

১. 'অধমের দৃষ্টিতে সম্মানিত আব্বাজান হযরতজি (মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.)-এর পর মারকাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো, কীভাবে এই দাওয়াতি মেহনতকে অক্ষুন্ন রাখা যায়? আমাদের বড়রা এই মেহনতকে যেই মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছেন, কীভাবে সেই মানহাজের ওপর এই মেহনতকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায়?'

আপনারা সবাই অবশ্যই খুব ভালো ভাবে অবহিত আছেন যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. যে তরিকায় এই দাওয়াতি মেহনত আঞ্জাম দিয়েছেন, সেই তরিকার ওপর আব্বাজান রহ. জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। যার বরকতে এই মেহনত সারা পৃথিবীতে এক ও অভিন্ন পদ্ধতিতে, অভিন্ন চিন্তা-চেতনায় পরিচালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন আমাদের বদআমলের পরিণতিতে সেই অভিন্নতা বিনষ্ট হতে চলেছে। সব জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন যেহনিয়্যাত বা মানসিকতা গড়ে তোলা হচ্ছে। যার ফলে মেহনতের ক্ষতি হচ্ছে, দুর্বলতা জেঁকে বসছে। পুরুষদের মেহনত যেমন প্রভাবিত হচ্ছে, মাসতুরাতের মেহনতও প্রভাবিত হচ্ছে। পুরনো সাথীদের মাঝেও দু' ধরনের যেহনিয়্যত তৈরি হচ্ছে।

আপনারা এই মেহনতের মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি ও আকাবির-আসলাফের তরিকাই এই মেহনতের প্রাণ। আমাদের মরহুম হযরতগণ এ পদ্ধতির উপরে থেকেই এই মেহনত চালিয়ে গেছেন। কাজেই البركة مع أكابركم – 'বড়দের সঙ্গে থাকার মাঝেই বরকত' এর উসুল মেনে আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সেই মানহাজের ওপর মেহনত ধরে রাখার পূর্ণ সাধনা ও প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ না করুন, যদি এই মুবারক কর্মপদ্ধতি আমাদের হাত ফসকে ছুটে যায় এবং নিত্য-নতুন পদ্ধতি সামনে আসতে থাকে তাহলে এই নতুনত্বের ধারা আর কখনই শেষ হবে না।

এ কারণে আমি স্রেফ এতটুকুই নিবেদন করব যে, এই মজলিসে শূরা মেহনতের সকল তাকাযা এবং এর উসুল ও নিয়ম-নীতিগুলোকে অবশ্যই দৃষ্টির সামনে রাখবে। মজলিসে শূরা সবসময় এ কথা ভাববে যে, আমরা যদি আমাদের আকাবির রহ. এর পদচিহ্ন থেকে যৎসামান্য পরিমাণও সরি তাহলে এতে শুধু আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে না; বরং পুরো উম্মতের ক্ষতি হবে। মেহনত বরবাদ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার হিফাযত করুন। আমিন।

২. এর পাশাপাশি পারস্পরিক মিল-সৌহার্দ্যও অনেক মূল্যবান সম্পদ। মতভিন্নতা কোনো ক্ষতিকর জিনিস নয়; কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান এই পথ ধরে খুব বেশি ধোঁকাবাজি করে যে, 'আমার অভিমত সঠিক। বাকি সবার মত ভুল।' তখন এটি আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ইজতিমাইয়্যাত বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাদেরকে মেহনতের যথাযথ মূল্যায়ন করা ও বোঝার ক্ষমতা দিন। আমাদের মাঝে যেমন

---

[৮], মহান পিতার মাঝে অকপটে সত্য বলার সাহস এবং হকের আওয়াজ বিশ্বের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্য কতটা জাগ্রত ছিল, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৭৭ সালের কথা। আসাম দাঙ্গার রক্তাক্ত অধ্যায়ের ফলে জরুরি অবস্থা চলছে। এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতি ও নাজুক মুহূর্তেও তাঁর মাঝে ঈমানি আত্মসম্মানবোধ ও সত্যের পক্ষে নির্ভিক অবস্থানের দৃঢ়তর মানসিকত এতটাই জাগ্রত ছিল যে, তিনি ওই সময় মহামতী ইন্দিরা গান্ধিকে একটি চিঠি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

হযরত শায়খুল হাদিস রহ. ওই সময় মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন সেই দাওয়াতি চিঠির কথা জানতে পারেন তখন ১৬ এপ্রিল ১৯৭৭ ঈ. তারিখে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে তৃতীয় হযরতজি রহ. এর এই পদক্ষেপের প্রশংসা ও সমর্থন করে লিখেছিলেন,

"আপনার উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উচ্চমর্যাদা দান করুন। আপনি তাবলিগের হক আদায় করেছেন। আমি দীর্ঘক্ষণ নিজেই নিজেকে যাঁচাই করেছি এবং পরিশেষে অনুতপ্ত হয়েছি এ কারণে যে, আমার পক্ষে তো এমন উত্তর লেখার দুঃসাহস হবে না।"

আমাদের বড়দের মত ফিকির নেই, তদ্রূপ তাঁদের মত কুরবানিও নেই। কাজেই এখন তাঁদের বাতলানো উসুলই আমাদের জন্যে ও এ মেহনতের জন্যে বাতিঘর।

৩. মেহনতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং মারকাযের চৌহদ্দির ভেতরকার নানা জটিলতা ও সমস্যা সম্পর্কে আপনারা সবাই সম্যক অবগত। অধমের দৃষ্টিতে এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, আমরা আমাদের বোধ-উপলব্ধি ও চিন্তা-ভাবনাকে আমাদের বড়দের বোধ, উপলব্ধি ও চিন্তা-ভাবনার অনুগত বানাব। আমরা দেখব, এ সব ক্ষেত্রে আমাদের বড়দের তরতিব কী ছিল। তাঁরা এ জাতীয় প্রেক্ষাপট সামনে এলে মেহনতকে ও মেহনতের নাজুক দিকগুলোকে কীভাবে সামাল দিতেন। আমরা যদি এ পথ না ধরে, উল্টো তাঁদের ও তাঁদের মেহনত-অবদানের সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ করি আর ভাবি যে, এর মাধ্যমে সংশোধন হবে তাহলে নিশ্চিত জানুন, আমাদের এই ভাবনা আমাদের জন্যে চরম অশুভ পরিণতি বয়ে আনবে।

নোট : আমি এই কথাগুলো লিখে শূরার সদস্যবর্গের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারা এ চিঠি পড়ে অভিমত দেন যে, এর মাঝে আরো কিছু সমস্যা ও জটিলতা যুক্ত করা দরকার, যার ওপর মজলিসে শূরা চিন্তা-ভাবনা করবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তখন যুক্ত করি,

১. 'অধমের কাছে **মুনতাখাব আহাদিসের** মাসআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মেহনতের সাথীরা এর কারণে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। কোনো ধরনের মাশওয়ারা ব্যতিরেকে বিভিন্ন ভাষায় এর তরজমা করানো হয়েছে। এখন এই চেষ্টা চলছে যে, জামাতে ও তালীমের হালকায় যেভাবে ফাযায়েলে আমল পড়া হয়, ঠিক সেভাবেই যেন মুনতাখাব আহাদিসও পড়া হয়। আমার কাছে এ ব্যাপারে অজস্র চিঠি আসছে এবং মেহনতের অসংখ্য সাথী মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করছে যে, এটি পড়া হবে, কি হবে না। বিষয়টি নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। খোদ আমাদের এখানে ঘরের ভেতর কোনো ধরনের মাশওয়ারা ও সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে এই কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

শূরার সদস্যবর্গকে একটি তথ্য জানানো প্রয়োজন মনে করছি। তা হলো, মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের মত আরেকটি কিতাব খোদ আমার আব্বাজান রহ. লিখেছিলেন। الأبواب المنتخبة من المشكوة (আল আবওয়াবুল মুনতাখাবাহ মিনাল মিশকাত)। যা তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর নির্দেশে সংকলন করেছিলেন। কিন্তু কখনই অধমের অন্তরে এ ভাবনা উঁকি দেয়নি যে, সারা পৃথিবীতে সেটির অনুবাদ করিয়ে আম তালিমের কিতাবের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে দেব। কেননা আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, এই ধারাবাহিকতা যদি একবার শুরু হয় তাহলে তা রোধ করা মুশকিল হয়ে যাবে।

এ কারণে অধমের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, উমুমি তালীম শুধু ফাযায়েলে আমলেরই হবে, যেমনটি বিগত ৭০ বছর ধরে হয়ে আসছে। আর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাঝে মুনতাখাব আহাদিস রাখা যেতে পারে।

২. অন্দরমহল সম্পর্কে আমি ইতোমধ্যে মৌখিকভাবে জানিয়েছি যে, বাইরের পুরুষদের হুজরা (সবার সর্বসম্মত প্রস্তাব লঙ্ঘন করে) মৌলভি সাদ সাল্লামাহু দখল করে নিয়েছেন। সম্মানিত আব্বাজান রহ. এর সকল সামানপত্র ও কিতাবাদি সেখান থেকে তুলে বাইরে রাখা হয়। তাহলে এখন কেন তিনি অন্দরমহলের ওপর জোরজবরদস্তি শুরু করেছেন! প্রথমে হুজরা সম্পর্কিত প্রস্তাবনাটি সবাই আরেকবার পড়ে নিন, যার ওপর সবার স্বাক্ষরও রয়েছে। এর ওপর চিন্তা করুন যে, সেখানে কেন সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমল হলো!?

এর পাশাপাশি শূরার সদস্যগণ অন্দরমহলেরও পর্যবেক্ষণ ও হিসাব-নিকাশ করে ফেলুন যে, কার কাছে কতটুকু অংশ আছে? কার কাছে কতগুলো কামরা আছে এবং কার কতটুকু প্রয়োজন?

এর বাইরে বাড়ির সমস্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এর মালিক কে? যদি মৌলভি সাদ সাহেব এর মালিক হন তাহলে অবশ্যই শরিয়তের দৃষ্টিতেও তিনি এর মালিক হবেন। আমি তার অধিকার অস্বীকার করতে পারি না। আর যদি তিনি এর মালিক না হন তাহলে তিনি যেন এ ধরনের অর্থহীন জবরদস্তি ত্যাগ করেন।

বাইরের হুজরা সম্পর্কে এ অনুভূতি আমাকে সবসময় পীড়া দেয় যে, যদি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত কার্যকর হতো তাহলে আমি মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করতে পারতাম। কিন্তু এখন শারীরিক ওজরের কারণে নিজের

হুজরার কাছেই আমাকে নামায পড়তে হচ্ছে।

৩. আরেকটি নিবেদন হলো, মসজিদওয়ারি মেহনত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সেখানে কোনো ধরনের সংযোজন, চাই সেই সংযোজন ইসতিকবালের জামাতের নামে হোক, বা অন্য এমন কোনো সূরতে হোক, যেই সূরত আমাদের বড়দের যুগে ছিল না, তা বিলকুল অসমীচীন ও মেহনতের জন্যে ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে অবশ্যই গভীর মনোযোগ দেবেন।

৪. অধমের আরেকটি অভিমত হলো, মারকাযে যারা মুকিম আছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তাদের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুসারে মেহনত নেওয়া হোক। নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে বিচার করা ঠিক হবে না। আলিগড়ের সাথীদের এখানে খুব বেশি কিয়াম হওয়া উচিত, যেন মারকাযের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ হয়, পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান হয়।

ওয়াস-সালাম।

বান্দা মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান কান্ধলভি

দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীগণ যদি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আমি এখানে একটি কথা নিবেদন করার দুঃসাহস দেখাতে চাই। তা হলো, এই মেহনতের মানহাজ অক্ষুণ্ন রাখা এবং মেহনতকে আকাবির রহ. এর তরিকার ওপর ধরে রাখার জন্যে আপনাদের এই দৌড়–ঝাঁপ ও নিরন্তর প্রয়াস এবং তা সফল করার জন্যে কর্ম-ময়দানে নেমে আসার এই উদ্বেগ আপনাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর। কিন্তু মাওলানা রহ. এর উপরের লেখাগুলো এ কথার জীবন্ত ও জাগ্রত প্রমাণ বহন করে যে, মরহুমের দৃষ্টি তখনই অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিল। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই নিজ মন ও মননের মাঝে এই মেহনতকে আকাবির রহ. এর তরিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার সুতীব্র ইচ্ছা ও তাকাযা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর মাঝে এত আগে কীভাবে এই দূরদর্শী তাকাযা জেগে ওঠেছিল! নিঃসন্দেহে এটি দু মহান শায়খ (শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. ও তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.) এর ঈমানদীপ্ত প্রতিপালন ও তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন খেদমতের বদৌলতেই তাঁর মাঝে প্রকাশ পেয়েছিল।

এটাই ছিল সেই মজলিসে শূরার পঞ্চম ও শেষ বৈঠক। সেই বৈঠকের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি তখনই ঘটে, যখন সেই মজলিসে উপস্থিত সবচেয়ে কমবয়স্ক সদস্য, যিনি এই দাওয়াতি মেহনতের উসুল, তাকাযা ও আদাব সামনে রেখে এই মেহনতে তিন দিনও সময় লাগাননি, তিনিই কি-না এই মজলিসে শূরার সবচেয়ে বয়োজৈষ্ঠ ও পুরনো মুবাল্লিগ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের চোখের ওপর চোখ রেখে এ কথা পর্যন্ত বলে ফেলল,

‘এই মেহনতের তুমি কী বোঝো। আমিই তো এই মেহনত পরিচালনা করে আসছি।’

কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই সত্য বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, ২০১৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত রায়ভেন্ড ইজতিমায় আলমি শূরার শূন্যপদ পূরণ হয়। এই পদক্ষেপ সারা বিশ্বের সাথীগণ উষ্ণ অভ্যর্থনায়, সাদরে বরণ করে নেন। ১৪৩৭ হিজরির হজ ও ২০১৬ সালের নভেম্বরের রায়ভেন্ড ইজতিমা সারা বিশ্বের সামনে এই বার্তা আরেকবার স্পষ্ট শব্দে জানিয়ে দেয় যে, এই দাওয়াতি মেহনত কোনো নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি পরিচালনা করছে না; বরং সবার সম্মিলিত প্রয়াসে মেহনত চলছে।

তাবলীগি মারকাযের অসংখ্য অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক হালত এবং ভেতর ও বাইরের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে এ অধম খুব ভালোভাবেই অবগত। মারকাযের ভেতরের একের পর এক ঘটে চলা দুঃখজনক ঘটনার অনেকগুলো অধম নিজের চোখেই দেখেছে। কিছু ঘটনা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজ কানে শুনেছি। কিছু তথ্য হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর দিনলিপি, অপ্রকাশিত লেখা ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ভাণ্ডার থেকে জানতে পেরেছি। বিশেষকরে একটি বিশেষ এলাকার বিশেষ মানসিকতার কিছু লোকের কাণ্ড-কারখানা, যা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর সেখানে সংঘটিত হয়, যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. নিজের রূহানি শক্তি, ঈমানি দূরদর্শিতা ও মুমিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে ইস্পাতকঠিন প্রাচীর হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

এমন কিছু কারণে অধমের প্রবল ইচ্ছা ছিল, এই মজলিসে শূরা মজবুত কাঠামো গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত হোক, তাহলে এর কল্যাণে অনেকগুলো ফেতনার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি এমন কিছু আক্রমণও প্রতিহত করা যাবে, যা

মারকাযের চৌহদ্দির ভেতরে ক্ষণে ক্ষণে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত জানান দিয়ে উঠছে। যদি সেই ফেতনাগুলো সফলভাবে দমন না করা হয় তাহলে অনাগত ভবিষ্যতে এই মেহনতের সম্মান ও ইজ্জত-আব্রু ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে। এজন্যে অধম সর্বান্তকরণে প্রচেষ্টাও চালিয়ে গেছে। কিন্তু তাকদিরের লেখন, কে করে খণ্ডন!

এ ভাবনা সামনে রেখে ওই মজলিসে শূরা কায়েম করার জন্যে বিভিন্ন সময় আমি যেই চেষ্টা ও প্রয়াস রেখেছি, তার অনেকগুলো তথ্য বিশদ বিবরণ সহকারে আমার দিনলিপির ডায়েরিতে লেখা আছে। আমার সেই প্রয়াসকে কেউ যদি 'ফ্যাসাদ-বিশৃঙ্খলা' মনে করে তাহলে এটা তার বিষয়। আমার শায়খ মাওলানা খলিল আহমদ মুহাজিরে মাদানি রহ. এর শিক্ষানুসারে আমি তাদের এই স্বার্থপর মনোবৃত্তিকে থোরাই আমলে নেব!

আমি নমুনা হিসেবে আমার দিনলিপির ডায়েরি থেকে সমালোচনাকারীদের সমালোচনা ডিঙিয়ে আমার গৃহীত প্রথম প্রচেষ্টা ও শেষ প্রচেষ্টার খানিকটা বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এ বিশ্বাস নিয়ে যে, সত্য অবশ্যই একসময় প্রকাশিত হয়। কারো নিন্দা বা গালি-গালাজ কখনই সেই সত্যকে দাবিয়ে রাখতে পারে না, কোনো অশুভ শক্তির সাধ্য নেই, সেই সত্য পায়ে পিষে হত্যা করবে। হয়তো সাময়িক চাপের কারণে সত্য কিছু সময়ের জন্যে আড়ালে থাকে; কিন্তু এই সাময়িক চাপ কখনই স্থায়ীত্ব পায়নি, আগামীতেও পাবে না।

১৪২৫ হিজরির রবিউস সানি মাসের প্রথম দশকে জনাব আলহাজ্ব রহমতুল্লাহ বানারসি সাহেব সেই শাখা মজলিসে শূরার জন্যে কিছু জরুরি পরামর্শ পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ সময়টাতে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার প্রয়োজন্যে জরুরি ভিত্তিতে আমাকে লাখনৌ ও ইলাহাবাদের সফরে বেরিয়ে পড়তে হয়। যার কারণে আমি দ্রুত পায়ে দৌড়-ঝাঁপ করে লাখনৌ, ইলাহাবাদ সফর সম্পন্ন করে দিল্লি চলে আসি। আমার জন্যে ওই সময় এই তিন জেলার সফরই খুব জরুরি ছিল। এর কোনো একটিতে দেরি করা হলে প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা ছিল।

ওই সময় আমাকে কী পরিমাণ ত্রস্ত পায়ে দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়েছিল, তার খানিকটা চিত্র আমার দিনলিপির ডায়েরিতে লেখা সফরনামা পড়লে বুঝে আসবে। নিআমতের শুকরিয়া হিসেবে সেখান থেকে দুটি চয়িতাংশ পাঠকদের সামনে মেলে ধরছি—

> '২৮ মে ২০০৪ ঈ. / ৮ রবিউস সানি ১৪২৫ হি. শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় সদভাউনা এক্সপ্রেসে চড়ে রওয়ানা হই। পরদিন শনিবার সকাল নয়টায় লাখনৌ পৌঁছে মাদরাসা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিই। মাগরিব থেকে ঈশা- এ সময়টুকুতে উকিল আবিদ আলি সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গে শলা-পরামর্শ করি। পরদিন রোববার সকালে তার সঙ্গে সাক্ষাত করে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিডিশন নম্বর ২৭/২৭ সম্পর্কে বিশেষ পরামর্শ করি। এরপর দুপুর বারোটায় প্রচণ্ড গরমের ভেতর বাসে চড়ে লাখনৌ থেকে ইলাহাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হই। মাগরিবের প্রাক্কালে সেখানে পৌঁছি। আমার সঙ্গে যেহেতু আবেদ আলি সাহেব ছিলেন, এজন্যে আমরা একটি হোটেলে উঠি। রাত দশটায় মাযাহিরুল উলূমের দু'জন আইনি উপদেষ্টা গিরদুয়ার সাহেব ও রবিকিরণ জৈন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেই মামলা-মোকাদ্দামার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করি, যা মুফতি মুযাফফার সাহেব রহ. মজলিসে শূরার কার্যসীমা ও এক্তিয়ারের ব্যাপারে দায়ের করেছিলেন।
>
> পরদিন সোমবার ১১ রবিউস সানি সকাল দশটায় ইলাহাবাদ হাইকোর্টে চলে আসি। সেখানেও রেকর্ড রুমে ফাইল পর্যবেক্ষণ করি। এরপর দু' লুকমা খাবার মুখে দিয়ে দুপুর একটায় প্রচণ্ড সূর্যতাপিত রৌদ্রের ভেতর দিয়ে বাসে চড়ে রওয়ানা হই। মাগরিবের পর লাখনৌ পৌঁছি। সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে রেলস্টেশনে চলে আসি। রাত দশটায় লাখনৌ মেইলে চড়ে দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা হই। যেহেতু পূর্ব থেকে রিজারভেশন করা ছিল না; এজন্যে টিটির সঙ্গে কথা বলে রিভার্জ বগিতে বসে পড়ি। শোয়ার মত সিট না পেয়ে দুই সিটের মধ্যবর্তী স্থানের খালি জায়গাতে বিছানা পেতে কোনোমতে রাত কাটিয়ে দিই। এভাবে সফর করে পরদিন সকাল আটটায় নিরাপদে দিল্লি পৌঁছি। হাজি রহমতুল্লাহ বানারসি সাহেবের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করার কথা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। মাগরিবের পর থেকে ঈশা পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর পুনার প্রফেসর মাসঊদ আবদুল হাইয়ের উপস্থিতিতে নিযামুদ্দিন মারকাযের স্থানীয় মজলিসে শূরার উসূল ও নিয়ম-নীতির ব্যাপারে দীর্ঘ শলা-পরামর্শ হয়।
>
> ২ জুন দিনটি দিল্লিতে কাটিয়ে পরদিন ৩ জুন সকালে প্রিয় ভাই সালমান মাদরাজির গাড়িতে চড়ে মৌলভি যুহায়র ও সাওদাকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে সাহারানপুর পৌঁছি। ওই সফরেই হযরতজির জীবনীগ্রন্থের তৃতীয়

খণ্ডের পূর্ণ সংক্ষেপনের কাজও সম্পন্ন করি। উরদূতে আরবিতে ভাষান্তরের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে সেই সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি মাওলানা ওয়াসিকুদ্দীন নদভির হাতে তুলে দিই।'

সেই স্থানীয় মজলিসে শূরা সম্পর্কে আমার দিনলিপির দ্বিতীয় তথ্য—

'২৭ শাওয়াল ১৪২৫ হি. / ১১ ডিসেম্বর ২০০৪ ঈ. তারিখে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে মারকাযের মজলিষে শূরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শূরার সদস্যগণ মৌলভি সাদ সাহেবকেও আহ্বান করেন। তিনি এসে বজ্রের মত হুঙ্কার ছুড়তে থাকেন। তার সবচেয়ে বেশি ক্রোধ বর্ষিত হয় অধমের ওপর। বারবার তিনি আমাকে গালমন্দ করেছেন। বৈঠকের সাথীদের মন্তব্য হলো, সেদিনের পুরো বেঠকে তার অণলবর্ষী মুখ থেকে পাঁচবার এই অধমকে 'খবিস' তকমায় ভূষিত করেছেন।

শূরার সদস্যগণ, বিশেষত জনাব আলহাজ্ব রহমত উল্লাহ সাহেব (বানারস) তার কথার প্রতিবাদ করে বলেন, 'এই শূরা গঠন করার কাজে আপনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শাহেদ ছিল না।' তখন তিনি ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দেন,

'আমি শূরা গঠন করার ওপর যেই সমর্থনমূলক স্বাক্ষর করেছিলাম, তা ফেরত নিচ্ছি। মেহনত তো আমিই করছি। আপনারা মেহনতের কী জানেন!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেই আকাবিরগণ বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই মেহনতের পেছনে তাঁদের জান, মাল ও ওয়াক্ত ব্যয় করে আসছেন, তারা সেদিনের চিত্র দেখে মনোক্ষুণ্ন হয়ে, উপরন্তু সাহেবযাদার মুখ থেকে এই সার্টিফিকেট পেয়ে সর্বসম্মত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানীয় শূরা নিঃশেষ করে দু'জনকে লিখিত ভাবে অবহিত করেন।

যেমনটি উপরে লিখেছি যে, শূরার সেই সর্বশেষ বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গালিগালাজ আমার ওপর পড়েছিল। সেই ঘটনার পর ইতোমধ্যে তেরোটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আমি আমার নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকামী মনোভাব, সহমর্মিতা ও অন্তরের অষ্টপ্রহরের দহন-জ্বলন নিয়ে বলবো— আমি এখনো সর্বান্তকরণে এ কথা বিশ্বাস করি যে, 'যদি সেদিন তিনি এই স্থানীয় মজলিসে শূরাকে সহায়তা করতেন; আমিত্ব, আত্মম্ভরিতা ও জিদ্দি মানসিকতা থেকে সরে এসে সেই শূরাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতেন তাহলে নিজ থেকেই অজস্র ফেতনা ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটতো। তাকে সেই অবমাননার সম্মুখীন হতে হতো না, যার মুখোমুখি তিনি এ সময়ে হচ্ছেন।

আসলে আল্লাহ তাআলাই তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখেন। তিনি তাঁদের সুনাম ও ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ রাখেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরিত ব্যবস্থাপনাতেই এই দাওয়াতি মেহনতের মানহাজকে কোনো না কোনো ভাবে হিফাযত করবেন। এজন্যেই দেখা যায়, স্থানীয় মজলিসে শূরার বিলুপ্তির দুঃখজনক ঘটনার পর একের পর এক এমন অভাবিত কাণ্ড-কীর্তি সবার সামনে চলে আসতে শুরু করে যে, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সেই ধারাবাহিক দুঃখজনক কর্মকাণ্ড দেখে অনেক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ তাঁদের আন্তরিক উদ্যোগ অন্তরের মাঝেই বিসর্জন দিতে শুরু করেন।

ওয়ারিশদের মাঝে বাসভবনের বাটোয়ারা

প্রাচীন আমল থেকেই দিল্লির নিযামুদ্দিন মারকাযের এক পার্শ্বে একটি পাকা বড় বাড়ি অন্দরমহল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সম্ভবত নিযামুদ্দিন মারকাযের ভবন যত পুরনো, এই অন্দরমহলের ইতিহাসও তত পুরনো।

কারণ হলো, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর সহধর্মিনী আজীবন এই অন্দরমহলেই বসবাস করেছেন। এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এর প্রথম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৩ মুহাররম ১৩৫৪ হি. / ১৭ এপ্রিল ১৯৩৫ ঈ. তারিখে। তিনি শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. এর কন্যা মুসাম্মাৎ যাকিয়্যা খাতুনকে বিয়ে করে সাহারানপুর থেকে উঠিয়ে এ ভবনেই সংসার পেতেছিলেন।

হযরত শায়খের আরেক কন্যা মুসাম্মাৎ যাকিরা খাতুনকে বিয়ে করেছিলেন হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.। তাঁরাও আজীবন এ ভবনেই দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করেন।

প্রথম স্ত্রীর ইনতিকালের পর হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. দ্বিতীয় বিয়ে করেন হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এর তৃতীয় কন্যা মুসাম্মাৎ রাশেদা খাতুনকে। আমৃত্য তাঁরাও এ ভবনে জীবন অতিবাহিত করেন।

এরপর যখন শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. হযতরজি মাওলানা ইউসুফ রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর সঙ্গে পরামর্শ করে মাওলানা মুহাম্মদ ইযহারুল হাসান রহ. নিযামুদ্দিন মারকাযে চলে আসেন তখন তিনিও সস্ত্রীক এ ভবনে নিবাস পেতেছিলেন। তাঁদেরও দিবস-রজনী এই ঐতিহাসিক ভবনের চৌহদ্দিতে অতিবাহিত হয়।

পরবর্তীকালে মাওলানা মুহাম্মদ হারুন রহ. মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহও-ও নিজ নিজ সহধর্মিনী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে এ ভবনে জীবন যাপন করেছেন।

ইনতিকালের অনেক আগে তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এই অন্দরমহলের উপরতলায় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর সঙ্গে বংশীয় সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একটি কামরা মাওলানা মুহাম্মদ তলহা সাহেবের জন্যেও নির্মাণ করেছিলেন।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা এ ভবনের চৌহদ্দির ভেতরে বরকত, রহমত ও প্রশান্তি দান করেছেন। এখানে যারাই প্রবেশ করেছে, তারা সবসময় অন্যরকম শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতি অনুভব করেছে।

এর পাশাপাশি এখানে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর এই ভবনে অবস্থানের সুবাদে এখানকার আলো-বাতাসে সবসময় অফুরন্ত কল্যাণ ভেসে বেড়ায়। যার ফলে চিরকালই এখানে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ বিরাজ করেছে।

আমার শৈশবের তাজা স্মৃতিগুলো এখনো চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন আসরের পর এ ভবনের উঠানের মাঝখানে তিন-চারটি পালং পাতা হতো। মাঝখানের পালংয়ে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. বসতেন। ডান-বামের লাগোয়া পালংদুটিতে মরহুমা আম্মাজি (অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর আম্মাজান) ও মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. বসতেন। এরপরের পালংগুলোতে অন্যান্য মহিলাগণ নিজ নিজ অবস্থান অনুসারে বসতেন।

তখন চা পর্ব চলতো। বিভিন্ন ঘরোয়া বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতো। এর পাশাপাশি আগত মাস্তুরাতের জামাত নিয়ে আলোচনা হতো। (ওই সময় এমন জামাতের সংখ্যা ছিল খুবই কম)। এখানকার আলোচনা সবাই মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে এই বৈঠকটি হতো না। কারণ, দিল্লির মহিলারা আসর থেকে ঈশা পর্যন্ত এখানকার ইজতিমায়ি তালিমে অংশগ্রহণ করতো।

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার দৃশ্য যেভাবে সারা দিন বাইর থেকে আগত লোকেরা মসজিদের ভেতর দেখতে পেতো, তেমনই তাদের সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির দৃশ্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অন্দরমহলের ভেতরে দেখা যেতো। অন্দরমহলের ভেতরের অধিবাসীগণ সেই সৌহার্দ্যের চাক্ষুষ সাক্ষী।

তৃতীয় হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর বদলে যায় তাকদিরের গতিপথ। এতোদিন যেখানে বিরাজ করতো ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য, যেখানের আলো-বাতাসে উড়ে বেড়তো পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা, এখন সেখানে জড়ো হয় হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার বিষাক্ত কালো মেঘ। আমরা ইতোপূর্বে যার ব্যাপারে বলেছিলাম যে, তিনি তার ভাষায় তৃতীয় হযরতজির বত্রিশ বছরের বিকৃতি নির্মূলের ঘোষণা দিয়ে ময়দানে নেমেছেন, তার পক্ষ থেকে অজস্র একপেশে দাবি-দাওয়ার হুমকি উঠতে শুরু করে। এমনই একটি দাবি হলো, এই অন্দরমহল খালি করে তার হাতে বুঝিয়ে দিতে হবে। দিন দিন সেই দাবি-দাওয়ার ওপর বলপ্রয়োগের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। নিত্যনতুন কৌশল-অজুহাত আসতে থাকে। অন্য জটিলতাগুলোর মতো এটিও একটি শক্ত রুক্ষ ও অপ্রিয় জটিলতা হিসেবে পুরো পরিবেশ কর্দমাক্ত করে তোলে।

এ বিষয়টি যখন সাধারণ মানুষের কানে যায়, তখন তাদের মুখ থেকে বিশ্রী মন্তব্য আসতে শুরু করে। সবচেয়ে কষ্টদায়ক ও লজ্জাস্কর মন্তব্য হলো, 'যে লোক নিজের ঘরের লোকদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারেনি, সে লোক কীভাবে পুরো উম্মতকে সৌহার্দ্যের বাঁধনে জুড়বে!'

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর সামনে এই জটিলতা যতো রুক্ষ ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই পেশ করা হতো, তিনি প্রতিবার শুধু এই একটি বাক্য বলেই নিজের কথা শেষ করে দিতেন,

'মামাজান রহ. ও আব্বাজান রহ. সবসময় একসঙ্গে থেকেছেন। আমরাও একসঙ্গে থাকব।'

মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এ সৌহার্দ্যময় পরিবেশ সম্পর্কে সবসময় এতোটাই নিশ্চিন্ত ও সহানুভূতিশীল থাকতেন যে, এর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতেও চাইতেন না। কিন্তু আমি যেহেতু দিব্যচোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম যে, ঘরের অভ্যন্তরে ক্রমশ সম্পর্কচ্ছেদের উত্তাপ বাড়ছে আর সৌহার্দ্যের ছায়ার পরিমাণ কমছে, অন্যদিকে ঘরের বাইরের পরিবেশে ক্রমশ আলোর পরিমাণ কমছে ও অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে, এজন্যে আমি কখনই তাঁর এই অভিমত ও ইচ্ছার সঙ্গে সহমত ছিলাম না। আমি সবসময় তাঁকে এ পরামর্শ দিতাম যে, এখন সম্মানজনক পদ্ধতিতে ঘর-দুয়ার পৃথক করে শান্তিময় জীবন যাপনের পথ বেছে নেওয়াই উত্তম হবে। কেননা পৃথিবীর সবাই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করবে যে, নিজের ঘরে শান্তি না পাওয়া গেলে পুরো পৃথিবীর কোথাও শান্তি মিলে না।

এভাবে খুব দ্রুত গতিতে সময়ের পালাবদল চলতে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষতার পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। হঠাৎ একদিন মাওলানা রহ. দিল্লি থেকে আমাকে ফোন দিয়ে বলেন, 'একটি জরুরি বিষয়ে কথা আছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে চলে এলে ভালো হতো।'

আমি দ্রুত নিযামুদ্দিন মারকাযে পৌঁছে যাই। তিনি আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে একজন খোদাভীরু তাহাজ্জুদগুজার হিতাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী ও নেককার মানুষের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনান। ওই স্বপ্নের মাঝে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর পক্ষ থেকে এমন একটি বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে, যার সত্যতা আমরা সেদিন দিব্যচোখে প্রত্যক্ষ করছিলাম। শুধু প্রত্যক্ষ করাই নয়; আমরা বরং হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছিলাম।

আমি সেই স্বপ্নের বিবরণ শোনামাত্রই আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে মাওলানা রহ.কে বললাম, আপনি এখন কালবিলম্ব না করে এর ওপর কাজ শুরু করে দিন। কারণ, স্বপ্নে যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের দৃষ্টিকোণ থেকে তা যে সত্য হতে চলেছে, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি।

পূর্ব থেকে যেই হযরতগণ বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, যেমন মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম (দেওলা) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (দিল্লি) জনাব ফারুক আহমদ (ব্যাঙ্গলোর), জনাব ভাই খালেদ সিদ্দিকি সাহেব, জনাব সানাউল্লাহ খান (আলিগড়) জনাব আলহাজ্ব রহমতুল্লাহ আনসারি (বানারস) ও জনাব আবদুল হাফিয মুনিয়ার (সুরাট) প্রমুখকে মাওলানার পক্ষ থেকে অবহিত করা হয় যে, 'আপনারা বাড়ি ভাগাভাগির কার্যক্রম শুরু করে দিন।'

সেমতে প্রথমে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা ভাবে পুরো অন্দরমহলের পরিমাপ করা হয়। এর ওপর ইনসাফের সঙ্গে দু'ভাগে ভাগ করে মাঝখানে স্পষ্ট বিভাজনরেখা টেনে দেওয়া হয়। মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব সবার কাছে নিজের এ অবস্থান স্পষ্টাভাবে জানিয়ে দেন যে, দু' ভাগের প্রতিটি আমার কাছে সমান। এরপর তিনি বর্তমান অবস্থানস্থলটি বুঝে নেন। বটোয়ারার পরপরই তিনি তার ভাগের নির্দিষ্ট অংশের পুরো ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করে সেখানে ওঠেন। এরপর থেকে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ তাআলা নতুন ভবনে এতো প্রচুর শান্তি, স্থিতি ও সহজ উপকরণ দিয়েছেন যে, পূর্বে এর কল্পনাও করা যেতো না। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله — "হে আল্লাহ, শোকল প্রশংসা শুধু আপনারই জন্যে। সকল শুকরিয়া শুধু আপনারই জন্যে।"

আল্লাহ তাআলা জনাব আলহাজ শরাফত উল্লাহ দেহলভি সাহেবকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি পূর্ণ মনোযোগ ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মাওলানা রহ. এর নতুন ভবনটি নির্মাণ করে দেন। নতুন ভবনে তিনি সার্বিক সুযোগ-সুবিধার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি আশপাশ থেকে উড়ে আসা কোনো ধরনের হুমকি-ধমকির পরোয়া করেননি।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮ জানুয়ারি ২০০৬ / ১৭ যিলহজ্ব ১৪২৬ হি. তারিখে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ নিয়ে একটি চুক্তিনামা তৈরি হয়। পাঠকবর্গের জন্যে আমরা সেই চুক্তিনামার অনুলিপি তুলে দিচ্ছি–

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

বাংলাওয়ালি মসজিদ বসতি হযরত নিযামুদ্দিন রহ. এ অবস্থিত আমাদের হযরতের অন্দরমহল, যেখানে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. ও পরবর্তীকালে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. বসবাস করেছেন। এখন আমরা দু'জন সেখানে বসবাস করছি।

আমরা দু'জনেই এখন অনুভব করছি যে, এখন আমাদের দু'জনের পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়ে গেছে। সন্তানরা বড় হয়েছে। আমাদের দু'জনের আত্মীয়-স্বজনও নিয়মিত আসা-যাওয়া করে থাকেন।

বর্তমান বাড়িতে আমরা এভাবে বসবাস করছি যে, একদিকের কিছু অংশে একজন থাকছি। অন্যদিকের কিছু

অংশে অপরজন থাকছি।

আমরা দু'জনই এখন এ প্রয়োজন অনুভব করছি যে, বাড়িটিকে দু' ভাগে ভাগ করা হোক। যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারেন এবং একজনের অংশে অন্যজনের অনুপ্রবেশ না হয়।

এই প্রয়োজনীয়তা সামনে রেখে আমরা পারস্পরিক পরামর্শ ও বন্ধু-বান্ধবের উপদেশ আমলে নিয়ে বাড়িটি দু'ভাগে বটোয়ারা করছি। কাগজের ওপর নকশা এঁকে দুটি ভিন্ন রঙে রাঙানো হলো। ভবিষ্যতে দু'জনই এ এক্তিয়ার লাভ করবেন যে, তারা নিজ নিজ প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার জন্যে নিজের অংশে যেমন ইচ্ছে অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবে। এ নিয়ে আমাদের দু'জনের কেউ কারো বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারবে না।

আমরা দু'জন এ কথা স্পষ্ট করাও জরুরি মনে করছি যে, এই বাড়ির ওপর আমাদের কারোরই কোনো মালিকানার দাবি নেই এবং এ বাড়িটি মসজিদ ও মাদরাসার অংশও নয়। বরং আমাদের বড়গণ আমাদের জন্যে তা ওয়াকফ করেছেন।

নকশার মাঝে সবুজ রঙে আচ্ছাদিত অংশে মাওলানা যুবায়রুল হাসান (রহ.) ও তাঁর ঘরের লোকজন বসবাস করবেন। গোলাপি রঙের অংশে মাওলানা সাদ সাহেব ও তার পরিবারের লোকজন বসবাস করবেন।

পুরো বাড়ির আয়তন ২৮২ বর্গ গজ। বাটোয়ারার পর প্রতি অংশে ১৪১ বর্গ গজ আসবে।

মহান আল্লাহ এই বাঁটোয়ারা কবুল করুন। এ উদ্যোগকে তিনি আমাদের পরস্পরে ও পরিবারদুটির মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান **মুহাম্মদ সাদ**

সাক্ষী :

১. রহমতুল্লাহ আনসারি (বানারস)
২. মুহাম্মদ ইয়াকুব (দিল্লি)
৩. সানাউল্লাহ খান (আলিগড়)
৪. মুহাম্মদ ইবরাহিম (দেওলা)
৫. বান্দা খালেদ সিদ্দিকি (আলিগড়)
৬. ফারুক আহমদ (ব্যাঙ্গলোর)

বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত কাগজে লেখার কিছু দিন পরের ঘটনা। মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব তাঁর অংশে নির্মাণ কাজ মাত্র শুরু করেছেন। হঠাৎ একদিন সাহেবযাদা প্রফেসর সানাউল্লাহ সাহেব আলিগড়ের মাধ্যমে মাওলানা রহ. এর কাছে বার্তা পাঠালেন যে, বাড়ির বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। কাজেই নতুন করে পরিমাপ করা হোক। কাজেই আপনি আপনার নির্মাণকাজ স্থগিত রাখুন।'

প্রফেসর সাহেব যখন এই বার্তা নিয়ে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর কাছে আসেন তখন উত্তরে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন যে, 'এ ব্যাপারে আপনি শাহেদের সঙ্গে কথা বলুন।'[৯]

প্রফেসর সাহেব যখন সেই বার্তা আমার সামনে পেশ করেন তখন আমি তাঁর কাছ থেকে প্রথমে এ অঙ্গীকার নিই যে, 'আমি এ বার্তার জবাবে যে কথা বলব, তা আপনাকে অবশ্যই 'বাদশাহ নামদারের' কাছে পৌঁছাতে হবে। তিনি তখন আমাকে পৌঁছানোর অঙ্গীকার দেন। আমি উত্তরে বলে দিই– 'বাড়ির বাঁটোয়ারার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন আপনি চাইলে মারকাযের বাঁটোয়ারার কাজ করে নিতে পারেন। তখন বুঝবেন, তাবলীগ কোন দিকে ছোটে'।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস, প্রফেসর সাহেব অবিকল আমার উচ্চারিত শব্দেই জবাবখানা তার কাছে পৌঁছিয়েছেন। কেননা পরবর্তীকালে সেই দাবি আর কখনই উত্থাপিত হয়নি।

দুটি জরুরি ব্যাখ্যা

১.

সবার অংশগ্রহণমূলক শূরাভিত্তিক নিযামের বিপরীতে যারা ব্যক্তিনির্ভর এক আমিরের নিযামকে প্রাধান্য দেন, সেই মহান

[৯]. এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমার দুচোখে হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর সুখস্মৃতি ভেসে ওঠে। তাঁর অভ্যাস ছিল, এ ধরনের প্রশ্ন কেউ তুললে তিনি বলতেন, 'মৌলভি ইনআমের কাছ থেকে জেনে নিন।'

মানুষদেরকে আমি অনুরোধ করব, দয়া করে আমার সেই জবাবি কথাটিকে আপনাদের নেতিবাচক ভাবনা ও স্বকল্পিত ধারণার অন্ধকারে রেখে পড়বেন না। আমি একটি বাস্তবতা আপনাদের সামনে মেলে ধরতে চাই। আমি যখন প্রফেসর সাহেবকে সেই জবাবি কথাটি বলছিলাম তখন আমার দু' কানে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. এর একটি কথা গুঞ্জরিত হচ্ছিল। তিনি একদিন তাঁর খুব কাছের এক শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,

'প্রিয়... হয় তুমি মৌলভি ইনআমকে মেনে চলো। নয়তো তাবলীগ অন্য কারো কাছে চলে যাবে।'

২.

তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর যেভাবে একের পর এক ফেতনার অনিরুদ্ধ ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে, তার বিবরণ ইতোমধ্যে পাঠকবর্গ পড়েছেন। আমি এ কথা অবশ্যই স্বীকার করব যে, এ সকল ফেতনার মধ্য হতে কিছু ফেতনার সম্পর্ক ঘরোয়া বিষয়াদি ও পারিবারিক মতবিরোধের সঙ্গে। যদিও এগুলো বড় ধরনের বিষয় ছিল না। এ ধরনের মতবিরোধ ও মনোমালিন্য সব পরিবারেই কিছু না কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সেই মতবিরোধ জন্ম নিয়েছে হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে। এ সকল মতবিরোধের নেপথ্যে একটি বহু দিনের ক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালা কাজ করেছে। সেই ক্ষোভের কারণ হলো, দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর দাওয়াতি মেহনতের যিম্মাদারি কেন তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর দিকে চলে গেল!?

কিন্তু ওই সময় সেই হাঙ্গামা যেহেতু কিছু ব্যক্তিবিশেষের মাঝে ছিল, ঘরোয়া ছিল, এজন্যে তা একান্ত সীমিত বলয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। এর পাশাপাশি মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর সীমাহীন ধৈর্য, দূরদর্শিতা ও কর্মকৌশলের কারণে তা মারকাযের চৌহদ্দির বাইরে বেরোয়নি। হযরতের ইনতিকালের পর যখন সাহেবযাদার হাতে বিশাল বিস্তৃত ময়দান চলে আসে তখন তিনি তার বিভিন্ন বয়ান, মালফুযাত ও খুতবার মাঝে পাখির মত ডানা মেলে উড়তে শুরু করেন। তিনি কুরআন-হাদিসের স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা, স্বকপোলকল্পিত বিশ্লেষণ ও নিজের রুচিমাফিক যেমন খুশি তেমন বয়ান, তাফসির, অপব্যাখ্যা ও ফিকহি বিশ্লেষণ কোনো ধরনের রাখ-ডাক ব্যতিরেকে জনগণকে শোনাতে শুরু করেন। যার ফলে সেই মতবিরোধ ও হাঙ্গামা ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া মহলের সীমা ডিঙিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যার ফলে সম্মানিত মুফতিয়ানে কেরাম থেকেও প্রচুর ফতোয়া জনগণের সামনে চলে আসে। বিভিন্ন ঘরানার উলামায়ে কেরাম থেকে একে একে অনেকগুলো রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ জনগণের হাতে হাতে পৌঁছে যায়।

তখন একান্ত নিরুপায় হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে সব ধরনের বক্রতা, পথভ্রষ্টতা এবং চৈন্তিক ও আদর্শিক গুমরাহি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহানের দুটি শেকড়স্পর্শী প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন ও মাশায়েখ সরাসরি ময়দানে নেমে দ্বীন ও শরিয়াতের হিফাযতের স্বার্থে, দাওয়াত ও তাবলীগের মানহাজ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে নাহি আনিল মুনকার বা অন্যায় হতে বাঁধা প্রদানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হন। অন্যদিকে দাওয়াত ও তাবলীগের পুরনো মুখলিস সাথীদের একটি সুবিশাল অংশ আলমি শূরার পৃষ্ঠপোষকতায় এই আলমি মেহনতের বাগডোর নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হন।

মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার সঙ্গে সম্পর্ক ও মাদরাসার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি

জামিয়া মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর ছিল মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর জ্ঞানচর্চার মাতৃক্রোড়। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখান থেকে ইলম অর্জন করে হাদিসের উসতাযগণ থেকে সনদ হাসিল করেছিলেন।

তাঁর শায়খ, উসতায, অভিভাবক ও মুরশিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. তাঁকে গভীর স্নেহ ও ভালোবাসার সঙ্গে দেখতেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখস্মৃতিগুলোর তালিকায় এ স্মৃতিও জ্বলজ্বল করে আলো ছড়াবে যে, শায়খুল হাদিস রহ. সবসময় তাঁর উপকার ও কল্যাণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রতিটি ফেতনা ও পদক্ষেপকে তিনি নিঃশব্দভাবে প্রতিহত করতেন। তিনি যেহেতু একজন মহান পিতার সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সন্তান ছিলেন, এই স্বতন্ত্র মর্যাদার কারণে প্রতিটি শ্রেণির লোকজন তাঁর শরণাপন্ন হতো। এ কারণে হযরত রহ. সেই ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের যাবতীয় সমস্যা ও জটিলতা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতেন।

অনেক দিন আগে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসা একটি বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। মাদরাসার মজলিসে শূরার সদস্যদের অন্তর্কলহের কারণে বিশাল জটিলতা সৃষ্টি হয়। তখন ওয়াকফ ও রেজিস্ট্রেশন নামের দুটি সুন্দর শিরোনাম দিয়ে সেই জটিলতার অবসান ঘটানো হয়। ওই সংকটময় মুহূর্তে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রভাব ও সম্পর্কের সকল শেকড় মাযাহিরুল উলূম মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানটির মজলিসে শূরার পেছনে উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। এই বাস্তবতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, তিনি সেই সংকটময় মুহূর্তে সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায্যতার প্রতি শতভাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

দিল্লির নিযামুদ্দিন বসতিতে বসবাসরত জনাব আলহাজ্ব হাফেয কারামত উল্লাহ, জনাব আলহাজ্ব হাফেয নিআমত উল্লাহ ও আলহাজ্ব সালামত উল্লাহ দেহলভি সেই সংকটময় মুহূর্তে যেভাবে জামিয়া মাযাহিরুল উলূমের পাশে ছিলেন, নানাভাবে অবদান রেখেছেন, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সরকারের বিভিন্ন স্তরে নিজ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে জনাব ডক্টর মুহসিন ওয়ালি (দিল্লি) বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছেন। তাদের অসংখ্য অবদানের ঘটনা অধম কখনই ভুলতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রত্যেককে যথোচিত উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

এ সকল হযরতের অগুণতি অক্লান্ত প্রয়াস তৃতীয় হযরতজির মাধ্যমে মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর আমলনামায় সদকায়ে জারিয়া হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইলমচর্চার এই মাতৃক্রোড়ের সঙ্গে মাওলানা রহ. তাঁর জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত এতোটাই গভীর সম্পর্ক রেখে গেছেন যে, সবসময় তিনি প্রতিষ্ঠানটির জন্যে অস্থির সহমর্মিতা অনুভব করতেন। সহযোগিতা ও সহায়তার সবগুলো পথেই তিনি আজীবন হেঁটে গেছেন। বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশের তাবলীগি যিম্মাদারদের কাছে সঠিক হালত তুলে ধরা, সময়ে-অসময়ে মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে প্রেরীত বার্তা উলামায়ে কেরাম ও জনদরদী ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌঁছানো, চরম দুর্যোগময় মুহূর্তে আস্থার সংকটের কারণে জামিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুহূর্তে আস্থা ও নির্ভরতা পুনর্বহাল করা, মজলিসে শূরার সদস্যদের মাঝে সমন্বয় বজায় রাখা–সহ মাওলানা রহ. এর এমন অজস্র অবদান রয়েছে, যা লিখতে গেলে বইয়ের কলেবর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

সাহেবযাদা নামদার (মৌলভি সাদ সাহেব) আজকের মত সেই সংকটময় মুহূর্তেও সবার অংশগ্রহণমূলক ইজতিমায়ি নিযামের বিপরীতে ব্যক্তিনির্ভর ইনফিরাদি নিযামের সহায়তায় ময়দানে নেমে এসেছিলেন। যার কারণে ওই সময় তার কাছে মাওলানা রহ. এর প্রতিটি উদ্যোগ ও প্রতিটি প্রয়াস চরম অপ্রিয় ঠেকতো।

হযরত রহ. প্রায় সময় মাযাহিরুল উলূমের স্বার্থে বড় বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অধমের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ধরনের সাক্ষাতগুলো মাদরাসার জন্যে বড় ধরনের উপকারিতা বারংবার বয়ে এনেছে।

মাযাহিরুল উলূমের সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে অধমের সঙ্গে মাওলানা রহ. যেই গভীর সহানুভূতিশীল আচরণ করেছেন, তা শুনলে যে কেউ অবাক হবে। যখনই আমি কোনো কাজে হযরতের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি, তিনি প্রতিবারই সেই চিঠি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ফিরতি চিঠিতে তিনি প্রচুর সান্ত্বনামূলক বাক্য লিখতেন এবং সমস্যার সমাধানের জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যেতেন।

একবার আমি মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে মাওলানা সমীপে চিঠি লিখি। গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি মৌলভি কারি আম্মার হাশেমি সাহেবের মারফতে সরাসরি দিল্লি নিযামুদ্দিনে পাঠিয়ে দিই। তিনি সেই চিঠি হাতে পেয়ে ১ রমাযান ১৪১৪ হি. / ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ ঈ. তারিখে জবাব লিখে পাঠান। যেখানে তিনি লিখেছিলেন,

> ‘‘রাতে তারাবির পর মৌলভি আম্মারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তোমার ভালোবার চিঠি আমার হাতে তুলে দেন। যা পড়ে তোমার কুশল জানতে পেরে প্রশান্তি অনুভব করছি।
>
> তুমি যে উদ্দেশ্যে মৌলভি আম্মারকে পাঠালে তার ওপর আমি খুবই অবাক ও বিস্মিত হয়েছি এ কারণে যে, এত ছোট কাজের জন্যে এত বড় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। মাশাআল্লাহ, শুধু তোমার চিঠিই যথেষ্ট হতো।
>
> আজ তো রোববার কেটে গেল। ইনশাআল্লাহ, কাল চেষ্টা করব। আল্লাহ আসান করুন ও কল্যাণ দিন। তোমাকে নিয়ে ও মাদরাসাকে নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকি। বিভিন্ন ধরনের খবর শুনতে পাই। আল্লাহ নিজ

নিরাপত্তায় তোমাদের আগলে রাখুন। সব ধরনের অকল্যাণ ও অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখুন।"

মাযাহিরুল উলূমের স্বার্থ ও এ জাতীয় বিষয় নিয়ে অধমের সঙ্গে আবেগমোড়ানো ভালোবাসা এবং সার্বিক পরিস্থিতির ওপর হযরতের সার্বক্ষণিক দৃষ্টি বোলানোর আরেকটি প্রমাণ হিসেবে দ্বিতীয় একটি চিঠি পাঠকদের সামনে মেলে ধরছি। প্রচণ্ড উত্তপ্ত আবহাওয়া চলাকালে হঠাৎ কলকাতা সফরের প্রয়োজন পড়ে। তখন আমি কিছু সময়ের জন্যে দিল্লি স্টেশনে অবস্থান করছিলাম। ওই সময় মাওলানা রহ. একজনের হাতে আমার কাছে নিম্নের চিঠিটি লিখে পাঠান,

প্রিয় মৌলভি মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব,

বাদ সালামে মাসনুন। কাল দুপুরে তোমার টেলিফোন আসে। তৎক্ষণাৎ তোমার স্ত্রী ও সহদোরাকে পৌঁছে দিয়েছিলে। নির্দেশ অনুসারে তোমাদের টিকিট ও খাবার পাঠিয়ে দিলাম।

জানি না, কেন তুমি নিযামুদ্দিন আসার প্রোগ্রাম বানালে না! সুপার ফার্স্ট ট্রেন দুপুর বারোটায় দিল্লি আসে। আর ডিলাক্স ট্রেন বিকেল পাঁচটায় দিল্লি ছাড়ে। মধ্যবর্তী সময়টুকু স্টেশনে না কাটিয়ে ঘরে কাটাতে পারতে। রোযার ভেতর যেখানে কামরা থেকে বাইরে বেরুনো মুশকিল হয়ে পড়ে, সেখানে আল্লাহ তোমাকে এমন শক্তি ও হিম্মত দিয়েছেন যে, তুমি রোযার হালতে এত লম্বা সফর স্টেশনে কষ্ট করে কাটাচ্ছো!

আবদুল্লাহ ইবনে মৌলভি সুলায়মানের হাতে থার্মাস পাঠাচ্ছি। যদি তোমার কাছে থার্মাস থাকে তাহলে তোমার থার্মাসে বরফ ঢেলে নিয়ো। নয়তো এটাই নিয়ে যেয়ো।

দয়া করে ফেরত নিয়ে আসবে। কাউকে হাদিয়া দিতে যাবে না। আলহামদুলিল্লাহ, তোমার স্ত্রী-সন্তানরা ভালো আছে। জানি না, তুমি কোন দিনে, কোত্থেকে, কোন সময়ে ফিরবে।

ওয়াস-সালাম।

মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান

একই ঘটনার প্রেক্ষিতে মাওলানার তৃতীয় আরেকটি চিঠিও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি–

'প্রিয় মৌলভি শাহেদ সাল্লামাহু,

মাসনুন সালামের পর। রাতে হাকিমজি তোমার চিঠি নিয়ে এসেছে। যেই চিঠির জন্যে আমি সুতীব্র অপেক্ষায় ছিলাম। কেননা আমি সাহারানপুর থেকে আসার পর থেকে তোমার কোনো ফোন পাইনি, কোনো চিঠিও আসেনি। শুধু এতটুকু জেনেছি যে, তুমি লাখনৌ চলে গেছো।

সবসময় তোমার চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরে বেড়ায়। তুমি (ওয়াকফ বোর্ড লাখনৌ) এর মামলায় ১৮ নভেম্বরের তারিখ চূড়ান্ত করেছো। জানি না, এতো দীর্ঘ তারিখ কেন ঠিক করলে! ওয়াকফ বোর্ড যখন তোমাকে কাঁচা লেখা দিয়েছিল তখন তুমি কেন বলে-কয়ে পাকা লেখা নিলে না! অহেতুক চল্লিশ দিনের বোঝা মাথার ওপর নিতে গেলে কেন!

আমার সাহারানপুর যাওয়ার আগে হাজি আলাউদ্দিন (মুম্বাই) এসেছিলেন। তখনই তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল যে, তিনি ১৫ তারিখে দিল্লি আসবেন। পরশু মাওলানা উমর সাহেব মুম্বাই থেকে ফিরে এসেছেন। আমি তাকে হাজি আলাউদ্দিন সাহেবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তিনি আমাকে বলেন, তিনি মুম্বাই থেকে সোজা দেওবন্দে যাবেন। সেখানে পরামর্শ করে এখানে আসবেন। কয় তারিখে পৌঁছুবেন, তা তাঁরও জানা নেই। এর পর তিনি কী করবেন, তা আমারও জানা নেই।

এর বাইরে সব কিছু ভালো ভাবে চলছে। মুহাম্মদ সালেহও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। কেবলা ভাই সাহেব, প্রিয় সাদেকা রাশেদকে আমার সালাম ও ছোটদেরকে আদর ও দুআ জানিয়ো।

ওয়াস-সালাম।

যুবায়রুল হাসান।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রতি গভীর ভালোবাসা

জামিয়া মাযাহিরুল উলূমের পাশাপাশি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সঙ্গেও মাওলানার গভীর সম্পর্ক ছিল। জমিয়তের সদর মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানি সাহেবের সঙ্গে তাঁর গভীর ইশকের সম্পর্ক ছিল। তিনি হযরতের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, বিশেষত ইলমি ও দ্বীনি ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

এমন দৃশ্য আমি অজস্রবার দেখতে পেয়েছি যে, দেশের কোথাও জমিয়তের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলে তিনি তাঁর আস্থাভাজন লোকদেরকে (যেমন দিল্লির নিযামুদ্দিনে অবস্থানরত মৌলভি মুহাম্মদ তাইয়্যেব কাসেমি, মৌলভি মুহাম্মদ কাসেম আবনা, মাওলানা রিয়ায আহমদ বারাবাঙ্কি প্রমুখ) পাঠিয়ে দিতেন। তারা মাওলানার নির্দেশ অনুসারে হযরত মাওলানা মাদানি সাহেবের ভাষণ শুরু হওয়া মাত্রই ফোনের সাহায্যে মাওলানার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন। মাওলানা তৎক্ষণাৎ মাদানি সাহেবের পূর্ণ ভাষণ নিজের কামরায় বসে শুনে নিতেন। দু'জনের মাঝে নিয়মিত বারবার দেখা-সাক্ষাৎ হতো। মহান আল্লাহ মাওলানা আরশাদ মাদানি সাহেবকে উত্তম বিনিময় দিন, মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পরও তাঁর সন্তানদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ ও হৃদ্যতার সেই সম্পর্ক অটুট ও অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

মাদরাসাতুশ শায়খ যাকারিয়া সাহারানপুরের প্রতি অনুরাগ

অধমের কুরআন কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান 'মাদরাসাতুশ শায়খ মুহাম্মদ যাকারিয়া লি-তাহফিযিল কুরআনিল কারিম সাহারানপুর'-এর সঙ্গেও মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর গভীর অনুরাগ ও আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তিনি সময়ে-অসময়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

নিঃসন্দেহে এটি পৃথিবীর একমাত্র প্রথম ও শেষ প্রতিষ্ঠান, যার বার্ষিক জলসার তারিখ তিনিই নির্ধারণ করতেন এবং পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে জলসা শেষে দুআ করতেন।

একবার তাঁর কাছে সাউদি আরবের *মাজমাউল মালিক ফাহাদ* থেকে মুদ্রিত কুরআন কারিমের অনেকগুলো কপি আসে। তখন তিনি সেগুলো মাদরাসাতুশ শায়কে এ কথা বলে পাঠিয়ে দেন যে, বার্ষিক জলসার সময় হাফেযদেরকে আমার পক্ষ থেকে পুরস্কার দেবে।

মাদরাসার বর্তমান বিস্তৃতি ও উন্নতির মাঝে নিঃসন্দেহে তাঁর দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে।

উপরে যেমনটি বলেছি যে, তিনি প্রতিবছর পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ সফর এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যেই করেছিলেন। সেই সফরটি করেছিলেন ২৪ যিলকদ ১৪৩৪ হি. / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঈ. তারিখে। তখন তিনি ট্রেনে চড়ে সাহারানপুরে অবতরণ করেন এবং বিস্তৃত পরিসরে আয়োজিত বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করে সমাপনী দুআ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন।

মহান আল্লাহ তাঁর ওপর বিস্তৃত রহমত বর্ষণ করুন।

।। তাম্মাত বিল খায়র ।।

এ বইয়ে হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর জীবনের এমন কিছু চিত্র ফুটে উঠেছে, যা দাওয়াত ও তাবলীগের বিদ্যমান সংকটের কিছু কারণ মোটা দাগে পাঠকের সামনে মেলে ধরবে।

পাশাপাশি এমন কিছু বিষয়েরও খোলাসা করা হয়েছে, যেগুলো জনসাধারণের জানা নেই। যেমন, *ফাযায়েলে আমলের* মুকাবিলায় *মুনতাখাব আহাদিস* নিয়ে আসা।

এ ছাড়াও মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবকে মানসিকভাবে কি কি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তার খানিকটা বিবরণও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদ
আশুলিয়া, ঢাকা
01842 12 22 25

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।
019 24 07 63 65